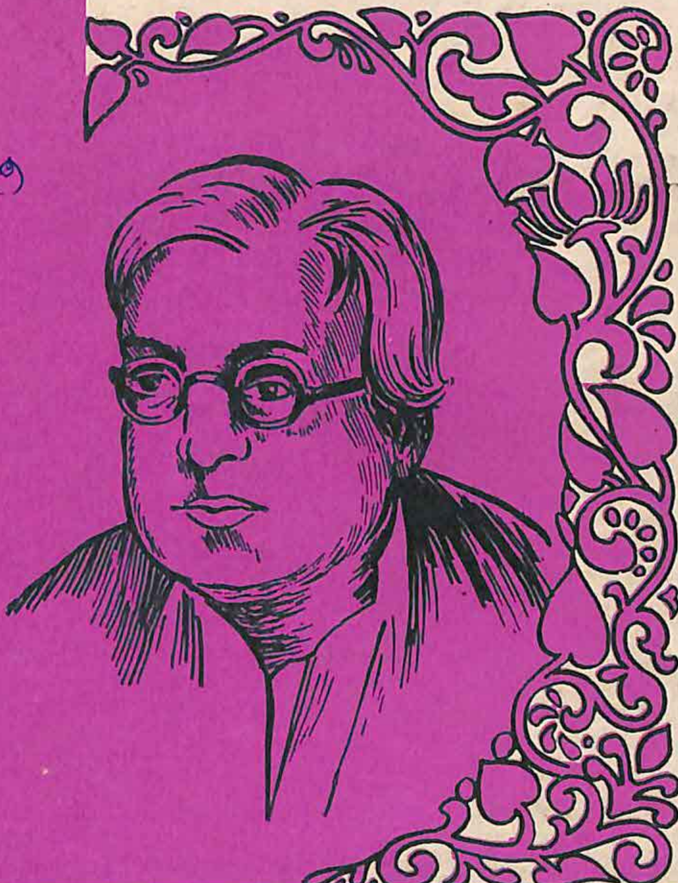
বিজ্ঞান সাধক সত্যেন্দ্রনাথ বসু



বিশ্ব বিশ্বাস

বিজ্ঞান-সাধক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীবিশ্ব বিশ্বাস

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫/১ এ, কলেজ রো, কলিকাতা - ৯

প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫/১এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মূল্য : আট টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীকৃষ্ণমোহন ঘোষ
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭/২ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

বিজ্ঞানসাধক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

লেখকের অন্যান্য বই

বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান (২য় সং)
বিক্ষুব্ধ বাংলা (২য় সং)
স্বাধীন বাংলাদেশ ও ভারত
জয় বাংলার মুক্তিযুদ্ধ
বীর বিপ্লবী বাঘা যতীন
বিপ্লবী সতীন সেন
বিপ্লবী সূর্য সেন (৩য় সং)
বীর সভারকর ও ধীংরা
শহীদ ভগৎ সিং
অনশন শহীদ যতীন দাস
ভক্ত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল
ভক্ত কবি রামপ্রসাদ
ম্যাকসিম গোর্কি
বাঙালীর পরিচয়
ছোটদের রামায়ণ
ছোটদের মহাভারত
ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র
নেতাজী সুভাষচন্দ্র
সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র
মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত
কর্মযোগী বিধানচন্দ্র
আচার্য পি সি. রায়
জহরলাল নেহেরু
বিদ্রোহী কবি নজরুল
বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্র

"Give me a place to stand
and I will move the earth !"

—*Archimedes*

[B. C. 287—B. C. 212]

ইউরেকা ! ইউরেকা !!

ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ সিসিলি-র অন্তর্গত 'সাইরাকিউজ' নামক ক্ষুদ্র নগরীর রাজপথে একজন লোক দু'হাজার দু'শ বত্রিশ বছর আগে সর্বাঙ্গসিক্ত, অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় ছুটতে ছুটতে চলেছেন—মুখে তাঁর ভাষা : ইউরেকা ! ইউরেকা !! [Eureka ! Eureka] অর্থাৎ পেয়েছি, পেয়েছি।

কী পেয়েছেন তিনি ?

সাইরাকিউজ নগরীর রাজা 'হাইরো'র জন্য এক স্বর্ণকার তৈরী করেছিলেন একটি স্বর্ণমুকুট। রাজার সন্দেহ হ'ল স্বর্ণমুকুটে আছে খাদ। পরীক্ষার ভার পড়লো রাজার প্রিয়বন্ধু আর্কিমিডসের উপর। আর্কিমিডস কত ভাবেন দিনরাত কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পান না। হঠাৎ একদিন···

ভাবতে ভাবতে তিনি এলেন তাঁর স্নানাগারে। স্নানাগারে টবভরা জল। তাতে নামতেই ভরতি টবের কিছুটা জল উপচে পড়ল। এই দেখে আর্কিমিডসের মাথায় এলো এক বুদ্ধি। তিনি সেই অবস্থায় ছুটলেন রাজার কাছে। মুখে ভাষা : পেয়েছি, পেয়েছি।

কী করে আর্কিমিডস বার করলেন সোনার খাদ। সামনে বসে তিনি সেই স্বর্ণমুকুটের সম-ওজনের খাঁটি সোনার আর একটি মুকুট তৈরী করালেন। তারপর তিনি জলভরা-পাত্রে ডুবালেন প্রথম মুকুট এবং

যে জলটা উপচে পড়ল তার নিলেন ওজন। এবার ঐ একই জলভরা-পাত্রে ডুবালেন দ্বিতীয় মুকুট এবং যে জলটা উপচে পড়ল তারও নিলেন ওজন। তখন তিনি জানালেন এই দুই ওজনের পার্থক্য যতটুকু ততটুকু খাদ ছিল প্রথম সোনার মুকুটটায়।

সামান্য ঘটনা—অনুসন্ধিৎসু মনের ভাবনায় সৃষ্টি করল এক বৈজ্ঞানিক সত্য। যার নাম 'আর্কিমিডসের সূত্র'। আধুনিক জগতের বিজ্ঞানচর্চায় 'আর্কিমিডসের সূত্র' অবলম্বনে 'আপেক্ষিক গুরুত্ব' (specific gravity) অর্থাৎ সম-আয়তনের জলের সাথে অন্য বস্তুর ওজনের প্রভেদ নির্ধারিত হয়।

সেদিন ইউরোপ—বর্তমান জগতের অপরীসীম বৈজ্ঞানিক উন্নতির হোতা ইউরোপ—ছিল অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন, অরণ্যচারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর চারণভূমি, অকথ্য কদাচার ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত যদিও ভারতে তার বহু পূর্বে আর্যঋষিগণের কণ্ঠে বিজ্ঞান-জগতের আদিসত্য সকলই উদ্‌গত। ঘুমন্ত ইউরোপের তমসা ভেদ করে সেদিন জ্বলে উঠল এই আর্কিমিডসের হাতে মধ্যযুগীয় পৃথিবীর বিজ্ঞান সাধনার দীপশিখা।

আর্কিমিডস ফিডিয়াবাসী জনৈক জ্যোতিষীর পুত্র এবং নিজে আলেকজাণ্ডারিয়ায় (গ্রীস) শিক্ষাপ্রাপ্ত বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ্।

জগৎ সৃষ্টির চিন্তায় ও অনুসন্ধিৎসু ভাবনায় বিজ্ঞানের অমোঘ শক্তি উপলব্ধি করে তাই আর্কিমিডস সেদিন রাজা হাইরোকে বলেছিলেন :

Give me a place to stand
and I will move the earth !

অর্থাৎ, আমাকে দাঁড়াবার জায়গা দিন—
আমি পৃথিবীটাকে করবো আলোড়িত !

রাজা হাইরো আর্কিমিডসের দাঁড়াবার জায়গা দিয়েছিলেন কিন্তু পৃথিবী আলোড়িত করবার আগেই আর্কিমিডসকে পৃথিবী থেকে নিতে হ'ল বিদায়।

রোমান যুদ্ধ জাহাজ এই ক্ষুদ্র নগরীকে গ্রাস করবার জন্য অগ্রসর হ'লে আর্কিমিডস তৈরী করেন দাহিকা-দর্পণ (**Burning Mirror**)—যার আলোয় ভস্মীভূত হ'ল রোমানদের সব যুদ্ধ জাহাজ।

পরবর্তী রোমান আক্রমণ ছিল সতর্ক। আকস্মিক আক্রমণে 'সাইরাকিউজ' নগরী হ'ল অবরুদ্ধ। প্রতিহিংসায় পশু-প্রায় রোমান সৈন্যগণ পদাঘাতে ভেঙে ফেললো আর্কিমিডসের কক্ষের রুদ্ধদ্বার। মেঝের উপর ছড়ানো বালি। মুখভরা দাড়ি···নিশ্চল বৃদ্ধ আর্কিমিডস সহাস্যবদনে আঁকছেন সেই বালির উপর হিজিবিজি রেখা।

রোমান সৈন্য রুষ্ট ভাষায় বলে উঠল ঃ এই বুড়ো, দাড়িওয়ালা ছাগল! ও-সব কি করা হচ্ছে? এখন মরার জন্য তৈরী হও।

আর্কিমিডস বললেন—একটু অপেক্ষা করো। দেখছো না দরকারী একটা সম্পাদ্যের সমাধান হয়ে আসছে।

···কিন্তু যুদ্ধবাজদের সৈন্য কি বুঝবে আর্কিমিডসের সম্পাদ্যের? না জানি বিশ্ববিজ্ঞানের জন্য তাতে ছিল কী সম্পদ! পদাঘাতে অর্বাচীন সৈন্য মুছে দিল আর্কিমিডসের বালির রেখা। তারপর রোমান সৈন্যের অস্ত্রাঘাতে বালিতে লুটিয়ে পড়লো বৃদ্ধ জ্ঞানী আর্কিমিডসের শুভ্র শির।

মধ্যযুগ শেষ হয়ে আসছে। সপ্তদশ শতাব্দী। আকবর মৃত (১৬০৫)। জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহরিয়র ও শাহজাহানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরোধে ভারতের সিংহাসন কণ্টকিত এবং হত্যালীলার পাশবিকতার মধ্যে শাহজাহানের রাজদরবারী জাঁকজমক ও আড়ম্বরের রাজত্ব সুরু—যার অন্তরালে শোষিত কৃষকদের ও বঞ্চিত শ্রমিকদের কান্না আর দীর্ঘশ্বাস।

আর তখন ইউরোপে ক্যাথলিকদের অত্যাচারে মথিত সত্য-সন্ধানীদের বুকের ভাষা। বাইবেলে উক্ত প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধ-বাদীদের খৃষ্টীয় ধর্মযাজকদের ধর্মাধিকরণ (**Inquisition**)-এ বিচারের নামে অদ্ভুত প্রহসন। বাইবেলে নাকি লেখা ছিল 'সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে'। ইউরোপের মানুষদের তাতেই ছিল বিশ্বাস। কিন্তু…

একজন ইউরোপবাসী জ্যোতিষী—নাম কপারনিকাস। তিনি বললেন: বাইবেলের উক্তি মিথ্যা। সূর্য স্থির গ্রহ। পৃথিবী আর অন্যান্য উপগ্রহ তার চারিপাশে ঘোরে। খৃষ্টান ধর্মযাজকদের ধর্মাধিকরণে এই জ্যোতিষ বিজ্ঞানীর বিচারের ব্যবস্থা হচ্ছে এমন সময় কপারনিকাস গেলেন মারা আর তাঁর বিচার হোলো না কিন্তু তাঁর শিষ্য গর্ডানো ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হোলো। আর তাঁর অপর শিষ্য গ্যালিলিও-র পোপের কাছে ডাক পড়লো।

গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) তাঁর জন্মস্থান ইটালির 'পিসা' বিদ্যালয়ে ছিলেন অঙ্কের অধ্যাপক। তিনি আবিষ্কার করেন 'টেলিস্কোপ' এবং বার করেন 'পেণ্ডুলাম সূত্র' [**Law of Pendulum**] ও পড়ন্ত বস্তুর গতিবেগ সূত্র [**Law of the motion of falling bodies**]।

তাঁর পরীক্ষা প্রত্যক্ষ দেখেও তাঁর সতীর্থগণ খুশী হতে পারলেন না। কারণ তাঁর মত নূতন এবং প্রচলিত মতের বিরোধী। ফলে তাঁর চাকুরী গেল।

পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয় ভেনিস রিপাবলিকে অবস্থিত এবং তজ্জন্য ইহা পোপের আঁওতার বাইরে। এখানে গ্যালিলিও-র চাকুরী হ'ল। আঠার বছর এখানকার কাজ। এখানেই তাঁর 'টেলিস্কোপ' আবিষ্কার।

এ সময় তিনি তদানীন্তন ইউরোপের বহু প্রচলিত মতের ভ্রান্তি

উদঘাটিত করেন এবং নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। এর পর তিনি ফ্লোরেন্সের বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী নিলেন।

এ অঞ্চল পোপের আঁওতার মধ্যে। তিনি গ্যালিলিও-কে তলব করলেন এবং বললেন—লিখে দাও সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে।

ক্যাথলিকদের ভয়ে গ্যালিলি-ও তাই লিখলেন কিন্তু লেখা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আর্তনাদ করে বলে উঠলেন ঃ 'কিন্তু তবুও ঘুরছে পৃথিবী'।

যাজকদের বিচারের হাত থেকে রেহাই পেলেও গ্যালিলিও-র সাথী হ'ল ভাগ্যের বিড়ম্বনা। চাকুরী গেল। একমাত্র কন্যা মারা গেলেন। শেষ কালে গেলো চোখ দুটো। তারপর ৭৮ বছর বয়সে নানা কষ্টের মধ্যে গ্যালিলিও-র হ'ল মৃত্যু-১৬৪২।

এ তো সেদিনকার কথা। তিন শ' সওয়া তিন শ' বছর আগেকার কথা। অথচ কতো, কতো, কতো আগে আমাদের ঋষিরা বলেছেন ঃ জগৎ = গম + ক্বিপ অর্থাৎ পৃথিবী গতিশীলা। আর্য ঋষিদের একটি শ্লোক ঃ করতল কলিতামল কষদমলং বিদন্তি যে গোলং।

এ শ্লোক ভারতবাসী হিন্দুর তৈরী। ইংরাজদের অনেক, অনেক আগে তাঁরা জানতেন—পৃথিবী গোল।

যে বছর গ্যালিলিও মারা গেলেন সেই বছর জন্ম নিলেন নিউটন (১৬৪২-১৭২৭)। ইনি যাজকীয় ও রাজকীয় মর্যাদা থেকে ওঁদের মতো বঞ্চিত হননি—বরং ইংরেজরা এঁকে মাথায় করে নেচেছেন এবং আইনষ্টাইন (১৮৮০-এপ্রিল ১৮,১৯৫৬)-এর আবির্ভাবের প্রাক্কাল পর্যন্ত ইনিই ছিলেন বিশ্ববিজ্ঞান রাজ্যের শিরোমণি কিন্তু বহু শতাব্দী আগে ভারতের আর্যভট্ট ও কণাদ নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) ও গতি (Motion)-এর সূত্রসমূহ আবিষ্কার করে রেখে গেছেন।

ভারতবাসীর কাছে নিউটনের আবিষ্কৃত সূত্র অতি পুরাতন। নীচের বিবরণ দেখে তা জানা যায়।

Law of Gravitation : *Newton.*

Any two particles of matter attract each other with a force directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them.

মাধ্যাকর্ষণ : আর্যভট্ট

আকৃষ্ট শক্তিশ্চ মহী,
যৎ তয়া প্রক্ষিপ্যতে,
তৎ তয়া ধার্যতে।

Law of Motion : *Newton.*

1st Law : A body cotinues in its state of rest or uniform motion in a straight line except in sofar as it is compelled by impressed forces to change that motion.

2nd Law : Change of motion is proportional to the impressed force and takes place along the straight line in which that force is impressed.

3rd Law : To every action there is an equal opposite reaction.

গতি সূত্র : কণাদ

প্রথম সূত্র : কর্ম কর্মসাধং ন বিদ্যতে।

দ্বিতীয় সূত্র : ন দ্রব্যং কার্যং কারণঞ্চ বধতি।

তৃতীয় সূত্র : কার্য বিরোধী কর্ম।

কণাদের সূত্র কত সংক্ষিপ্ত—অথচ কেমন সুস্পষ্ট। অবশ্য এটা সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব গুণ ও অলৌকিক বৈশিষ্ট্য।

ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ বিরোধের ফলে বৈদিকযুগের অন্তে ভারতীয় বিজ্ঞান-চর্চার দীপশিখা হয় এক রকম নির্বাপিত। এরই মধ্যে আমরা পাই অঙ্কশাস্ত্রে বিদুষী রমণী 'শুভঙ্করী' রচয়িত্রী লীলাবতী, যৌন শাস্ত্রে প্রাচীন প্রাচ্যের 'ফ্রয়েড' বাৎস্যায়ন, রসায়ণে নাগার্জুন, বস্তুবাদে প্রাচীন প্রাচ্যের 'সাণ্ডিফোর্ড' চার্বাক।

যীশুর জন্মের সমসময়ে কুষাণ যুগে পাওয়া যায় ভারতীয় জ্যোতির্বিদ গর্গ ও আয়ুর্বেদাচার্য চরকের নাম।

গুপ্তযুগে সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পাঠ পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। হিন্দুযুগের অন্তকালে গণিত-বিজ্ঞানে ভাস্করাচার্যের নাম ছিল সুবিদিত। মুসলমানদের সময় বাদশাদের রাজসভায় একদা ছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ—নাম গণক।

বাংলায় আয়ুর্বেদচর্চা, জ্যোতিষ শাস্ত্রানুশীলন ও কৃষিবিজ্ঞান ছিল বিশেষ সমাদৃত। আয়ুর্বেদচর্চায় বরেন্দ্রভূমির চক্রপাণি দত্ত, জ্যোতিষ শাস্ত্রে বরাহমিহির এবং কৃষিবিজ্ঞানে খনার নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতে তখন ছিল বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞান লেখক গিরিজাপতি ভট্টাচার্য যা লিখেছেন তা প্রণিধানযোগ্য (প্রবন্ধ : সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও নব্যবিজ্ঞান-বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম জন্মদিবস—শ্রদ্ধাঞ্জলিতে প্রকাশিত : ১লা জানুয়ারী ১৯৬৪) :

"একদিন জগৎকে ভারতের দান ছিল এমন যা গৌরবের বস্তু। দশকিয়া গণনা ও দশমিকের হিসাব এমনি এক অমূল্য দান,

প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে আজও তা প্রচলিত। ভারতের গণিতবিদ্‌রা কষে বার করে দিয়েছিলেন বৃত্ত ও ব্যাসের অনুপাতাংক। বলে দিয়েছিলেন বীজগণিতের বর্গমূল নিষ্কাষণ সূত্র।

আর জ্যোতির্বিদরা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করেছিলেন সৌর-বৎসর-মাস-চান্দ্রমাসের দিন সংখ্যা, অয়ন চলনের গতি, সূর্য-পরিক্রমণের পথ, ক্রান্তিপাত ও গ্রহগণের অবস্থানাদি।

আর্যভট্টই জগতের মধ্যে প্রথম অনুমান করেছিলেন আকাশে নক্ষত্ররাশির পশ্চিমাভিমুখে গমনের কারণ হ'ল আসলে পূর্ব মুখে পৃথিবীর গতি।

তিনি বলেছিলেন, "অনুলোমগতি নৌস্থ পশ্যত্য চলং বিলোমগং যদ্‌বৎ, অচলানি ভানি তদ্‌বৎ সম পশ্চিমগামি"— পূর্বদিকগামী নৌকাস্থ ব্যক্তি যেমন তীরের বৃক্ষরাশিকে পশ্চিম মুখ-গামী দেখে, তেমনি পৃথিবীর পূর্বদিকে গতির জন্যই আকাশস্থ নক্ষত্ররাশিকে সমপশ্চিমগামী দেখায়। আপন কক্ষে পৃথিবীর আবর্তনের কথা স্পষ্টত এতে বোঝায় না; কিন্তু গতি যে নক্ষত্রের নয়—পৃথিবীর, এ তথ্য প্রথম তাঁরই কাছে উদ্ভাবিত হয়েছিল।

এমনি আর এক জয়পতাকা স্বরূপ প্রোথিত রয়েছে শিল্প কৃতিত্বের নিদর্শন পঞ্চম শতাব্দীতে ঢালাই লোহার বিষ্ণুস্তম্ভ কুতুবমিনারের প্রাঙ্গণে। উপনিষদ, দর্শন, ব্যাকরণ, শব্দকোষ, কাব্য, মহাকাব্য, কাব্য-জিজ্ঞাসা, উপাখ্যান, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্যশাস্ত্র, ছন্দশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, কামশাস্ত্র প্রভৃতিতে ও কলাশিল্পে ভারতের কৃতিত্ব জগতের ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদস্বরূপ।

(আর) ভারতের ঋষিরাই জগতে প্রচার করে গেছেন

অদ্বৈতবাদ, যাকে বলা যেতে পারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু বিদ্যমান তা-সবের অভিন্ন একীকরণ মন্ত্র…

বিজ্ঞানে অতীত ভারতের গৌরবকথা বলে গিরিজাপতি আগামী দিনের আশার বাণী আমাদের শুনিয়েছেন। তিনি ঐ প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

মধ্যযুগ থেকে এমন কোনো দান বা কীর্তি ভারতের নেই যা জগৎকে জ্ঞানে গরিমায় বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করেছে। যদি বা থাকে তবে তা নগণ্য। সৌভাগ্যের কথা বর্তমান শতাব্দীতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ক্ষণজন্মা মনীষী বিজ্ঞান ও সাহিত্যে এমন আবিষ্কার ও রচনা সাধিত করেছেন যা জগতে শুধু স্বীকৃত ও গৃহীত হয়নি, পরন্তু যা পাঠ্যবিদ্যায় অঙ্গীভূত হয়েছে ও নিত্য ব্যবহৃত হচ্ছে এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ও রচনার সমতুল্য বিবেচিত হয়েছে। ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে অগ্রসর এই সব বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের মধ্যে **'বোস-আইনষ্টাইন সংখ্যায়ন'** অথবা **'বোস-সংখ্যায়ন'** অন্যতম।

এর জনক হলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এটি রচিত হয় ও স্বয়ং আইনষ্টাইন কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে তাঁরই উদ্যমে প্রকাশিত হয়। সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বছর পরে সম্প্রতি লণ্ডনের রয়াল সোসাইটী এর রচয়িতাকে ফেলো নির্বাচিত করে সংবর্ধিত করেছেন। কিন্তু বহু পূর্বেই **বোস-সংখ্যায়ন** আপন উৎকর্ষে জগতে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারে ব্রতী আজ ভারত তথা বাংলার নব্যবিজ্ঞানীগণ। ভারতীয়দের নবজাগরণের স্থান কলকাতা ও কাল ঊনবিংশ শতাব্দী।

পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ প্রমুখ ইংরেজ সওদাগররা দেশের কৃষক কারিগরদের শোষণ ও পীড়নে ধ্বংস করলেন কিন্তু সমাজের মধ্যবিত্ত ও উপরতলার মানুষদের নিজেদের দলে ভিড়োবার জন্য চেষ্টা করলেন ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোক্তা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী, মিশনারী ও এতদ্দেশীয় কিছু ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শিক্ষায় ও সাহিত্যে বাঙালী ভারতের মধ্যে হ'ল অগ্রণী।

ইংরেজী শিক্ষাবিস্তার বাঙালী তথা ভারতবাসীর নবজাগরণের মূল। দীর্ঘ পরাধীনতায় পরাজয়ী মনোবৃত্তি সম্ভূত শম্বুক সঙ্কোচ এড়িয়ে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজদের অনুসরণে নানা কর্মযজ্ঞে হলেন যুক্ত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শিক্ষা ও সাহিত্য হ'ল এই নব্য-শিক্ষিত বাঙালীর কর্মযজ্ঞের প্রথম অঙ্গ। সিপাহী বিদ্রোহের পর নীলবিদ্রোহের ফলে এলো রাজনীতি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি তার সাথে যুক্ত হ'ল ধর্মাদর্শ ও বিজ্ঞানচর্চা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আগে ছিল কেবলমাত্র পরীক্ষক সংস্থা। স্নাতকদের উচ্চশিক্ষার ভার ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের উপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ (Vice chancellor) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আন্দোলনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকদের উচ্চতর কলা, বিজ্ঞান ও আইন পড়াবার নিল ভার এবং বিখ্যাত বাঙালী আইনজীবি তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী বসুর অর্থসাহায্যে পার্শিবাগানে ৯২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড (প্রাক্তন অপার সারকুলার রোড)-এ তৈরী 'কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ' (স্থাপনা কাল : মার্চ ২৭, ১৯১৪)-এ উচ্চতর বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা হয়। তার পূর্বকাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে ছিল এম-এস-সি পড়াবার ব্যবস্থা।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে প্রায় সকলেই

ইউরোপীয়। দু-একজন এদেশীয় লোক নিযুক্ত হতেন। দেশীয় লোকদের অধিকতর পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও নিম্নতর বেতনে প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগে নিযুক্ত করা হ'ত কিন্তু ইউরোপীয়গণ নিম্নতর পাণ্ডিত্য থাকলেও সর্বোচ্চ বেতনে ভারতীয় শিক্ষাবিভাগ (I. E. S.)-এ নিযুক্ত হতেন। এই পক্ষপাত মূলক আচরণ শুধু হাস্যকর নয়···অপমানজনকও।

সাগরপারে শিক্ষারত দুজন বাঙালী তরুণের স্বপ্ন তখন—বিজ্ঞান বিমুখ বাঙালী তথা ভারতীয়দের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সৃজন এবং জগৎসভায় বিজ্ঞানে ভারতের আসন গ্রহণ। একজন হলেন পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র—নাম জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭)। আর অপরজন হলেন রসায়ন শাস্ত্রের ছাত্র—নাম প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪)।

জগদীশচন্দ্র কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ট্রাইপস্ পান এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.-এস-সি ডিগ্রি (পরে ডি.-এস-সি) নিয়ে দেশে ফিরলেন—১৮৮৫ এবং প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস-সি উপাধি নিয়ে দেশে ফিরলেন ১৮৮৮।

গবেষণার পক্ষে শিক্ষাবিভাগের চাকুরি সহায়ক। গবেষণার জন্য দুজনাই প্রেসিডেন্সি কলেজে নিলেন অধ্যাপনার কাজ। জগদীশচন্দ্র ১৮৮৫-তে এবং প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৮৯-এ প্রেসিডেন্সি কলেজে করলেন যোগদান।

এই দু'জনা-ই বিংশ শতাব্দীর নব্য-বিজ্ঞানের মহান্ পথিকৃৎ। এঁদেরই আদর্শে, প্রেরণায় ও শিক্ষায় সংখ্যাতীত বৈজ্ঞানিকের সৃষ্টিতে ভারতমাতার ললাট আজ উদ্ভাসিত।

আমরা ভুলতে পারি না সেদিন এই দুই বিজ্ঞানীর কষ্ট, পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকারের কথা। ল্যাবরেটরিতে সাজ-সরঞ্জাম নেই—তা সংগ্রহ। ছাত্রদের বিজ্ঞান-চর্চায় অবহিত করবার জন্য অধিকতর পরিশ্রম। অধ্যাপনার ছুটির পর আবার ল্যাবরেটরিতে গবেষণা। এ ছাড়া আরও কাজ:

ক) বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রচার ও বিজ্ঞান গোষ্ঠীর সৃষ্টি,

খ) আবিষ্কার,

গ) বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ,

ঘ) বিজ্ঞান সাহিত্যের সেবা

এত পরিশ্রম—তার উপর বিদেশী সরকারের অপমান ও অবহেলা। সাহেবদের অর্ধেক বেতন, ছুটিও কম আবার মাথার উপর নিম্নতর পাণ্ডিত্যের সাহেব। হায় পরাধীনতা!

ভারতীয় ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগ দিবার জন্য সুবিখ্যাত বিজ্ঞান-প্রেমিক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৭৬ সালে ২১০ বৌ বাজার স্ট্রীটে স্থাপনা করেন **Indian Association for the cultivation of science.** ১৯৫১ সালে ইহা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়। এখানে গবেষণা করে **রমন** আবিষ্কার করেন **আলোক বিচ্ছুরণ (X'Ray)** এবং **কৃষ্ণান** আবিষ্কার করেন **কৃষ্টালে চুম্বকত্ব**। রমন তাঁর আবিষ্কারের জন্য 'নোবেল' প্রাইজ পান—১৯৩০-এ।

এ ছাড়া তখন আর কোন গবেষণাগার ছিল না। জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র বহু কষ্টে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছোট গবেষণাগারকে করেন সুসমৃদ্ধ। ভারতের বহু কৃতী সন্তান এবং খ্যাতনামা কৃতবিদ্য বহু বিজ্ঞান-অধ্যাপক ও রাসায়নিক এঁদের ছাত্র। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পরিকল্পনা দপ্তরের সদস্য ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, লেখক রাজশেখর বসু, পশ্চিম বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ, বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহা ও ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও অধ্যক্ষ পঞ্চানন নিয়োগী এবং আরও অনেকে—যাঁরা বর্তমান ভারতের নব্য-বিজ্ঞানের শিরোমণি।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের **'মারকুরস-নাইট্রাইট'** $Hg_2(No_2)_2$ আবিষ্কার (১৮৯৬) পৃথিবীখ্যাত আবিষ্কার এবং পৃথিবীর সর্বত্র

পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার **'অদৃশ্য আলোক'** ও **'বেতার'** (১৮৮৫-৯৫) অভূতপূর্ব আবিষ্কার।

লণ্ডনের বৈজ্ঞানিক সমাজে গবেষণার পরীক্ষা দেখাতে না পারলে আবিষ্কারকদের আবিষ্ক্রিয়া তখন স্বীকৃতি পেতো না। ভারতবাসীর উদাসীনতায়, বিদেশী সরকারের অবহেলায় ও অর্থের অভাবে নিজের বেতার-যন্ত্রের পরীক্ষা ইউরোপে গিয়ে দেখাতে পারেননি জগদীশচন্দ্র সেদিন। ইতিমধ্যে ইতালি থেকে লণ্ডনে গিয়ে মার্কনি নিজের বেতার যন্ত্রের পরীক্ষা দেখালেন। যদিও মার্কনির যন্ত্র জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রের পর তৈরী হয় তবুও মার্কনি-ই পেলেন আবিষ্কারকের সম্মান। তবুও পৃথিবীর সর্বত্র জগদীশচন্দ্র বেতারের অন্যতম আবিষ্কারকরূপে খ্যাত। তাঁর অপর আবিষ্কার **'উদ্ভিদ ও জড়ের প্রাণ'**। নিজ উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে ইহা প্রমাণিত এবং সারা বিশ্বে স্বীকৃত। এ আবিষ্কার যুগান্তকারী।

এই দুই নব্য-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ-এর দুই শিষ্য ভারতের এই নব্য-বিজ্ঞানের দুই শিরোমণি। একজনার নাম ডঃ মেঘনাদ সাহা (মৃত্যু—১৮৫৬)—যাঁর আবিষ্কার **Theory of Equation.** অপর জন ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪) যাঁর আবিষ্কার **Bose-Einstein Statistics** (**বোস-আইনষ্টাইন** বা **বোস সংখ্যায়ন**) ১৯২৪। বোস সংখ্যায়ন বৈজ্ঞানিক জগতে বিজ্ঞান-চর্চায় সর্বত্র অবলম্বিত।

বিজ্ঞানে ভারতের লুপ্ত গৌরব ভারতীয়দের নব্যবিজ্ঞানের অভিযানে করেছে প্রত্যাবর্তন। আজ ভারতে বিজ্ঞান সাপেক্ষ সর্ববিধ কর্মযজ্ঞে ভারতীয়রা স্বয়ম্ভর। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় যে সব মৌলিক অভিব্যক্তি বিজ্ঞান-জগতে আত্মপ্রকাশ করছে তা মূলতঃ ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। সাড়ে তিন শ বছর আগেও ইউরোপের ক্যাথলিক

ধর্ম নব নব বিজ্ঞান চিন্তার ছিল প্রতিবন্ধক কিন্তু বহু শতাব্দী আগে ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম ছিল নব নব সৃষ্টিধর্মী চিন্তার বাহন।

আমরা মূঢ়—তাই ভুলে যাই কিন্তু সৃষ্টিধর্মী সাধনার দিন আগত। ভারত বহু সমস্যা প্রপীড়িত। তবুও এরই মধ্যে ভারত সাধনায় দিগ্বিজয়ী হবার ক্ষমতা, ঐতিহ্য ও সম্ভাবনার অধিকারী।

চলুন একবার সাগরপারে ঘুরে আসি। দেখে আসি কি সব চিন্তাধারার হচ্ছে অভ্যুদয়। ধর্মদর্শনের সাথে বিজ্ঞানদর্শনের দ্বন্দ্ব আজ সেখানে অপসৃত। অজ্ঞনতা সম্ভূত ধর্মের কুসংস্কার ও তার গোঁড়ামি আজ নিয়েছে বিদায়। **নিউটন** (১৬৪২-১৭২৭)-এর যুগে উঠেছিল এরই শঙ্খধ্বনি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সুরু হ'ল আইনষ্টাইনের সাধনায় নূতন যুগ—নব্যবিজ্ঞানের যুগ···আরও প্রগতিমুখী। আইনষ্টাইনের জার্মানীতে য়িহুদীর ঘরে জন্ম—১৮৮০। অণু-পরমাণু নিয়ে তাঁর গবেষণা। তাঁর জীবনে যখন কৈশোর কাল তখন ভারতের একজন নব্য বিজ্ঞানী—নাম জগদীশ বসু পৃথিবীকে শোনালেন বিজ্ঞানের এক নূতন কথা: Life is one অর্থাৎ উদ্ভিদ, জীব আর ধাতুর জগৎ এক। নিজের হাতে খুব ছোট ছোট যন্ত্র তৈরী করে তিনি প্রমাণ করলেন এই সত্য।

জগদীশ চন্দ্রের এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে দার্শনিক মানে উপনয়নে প্রভাবিত হন আইনষ্টাইন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের য়িহুদী নিধনযজ্ঞের জন্য আইনষ্টাইন দেশত্যাগে বাধ্য হন এবং মার্কিন মুলুকে আশ্রয় পান এবং সেখানকার এক হাসপাতালে প্রাণ ত্যাগ করেন—এপ্রিল ১৮,১৯৫৫।

শোনা যায় এঁরই কাছে মার্কিনরা পরমাণবিক শক্তি (মহাভারতে উক্ত 'ব্রহ্মশিরা')-র পায় সন্ধান—যার ফলে তুই এটম বোমায়

জাপানের দুটি দ্বীপ 'হিরোশিমা' ও 'নাগাসাকি' ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং জাপান আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

আইনষ্টাইন মানুষের ধ্বংস চাননি—চেয়েছিলেন মানুষের মঙ্গল। কিন্তু তা হয়নি। আজ সব উন্নত দেশের ঘরে ঝুড়ি ঝুড়ি এটম বোমা। ঠাণ্ডা লড়াই জমছে। বোমা ফাটবে না তো! পৃথিবীর মানুষ কি পাবে পরমাণবিক শক্তির মঙ্গলময় আশীর্বাদ?

আইনষ্টাইন মরেছেন কিন্তু তাঁর যুগ আজও চলমান। বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনায় আজও চঞ্চল। বিজ্ঞান আসলে কি? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিত্য কতো রহস্যময় ঘটনা। সে সবের অনুমিত ও পরীক্ষিত সঙ্গত কারণ প্রদর্শন এবং স্বীকৃতব্য ব্যাখ্যা উপস্থাপনই বিজ্ঞান। এই কার্য নিয়েই বৈজ্ঞানিকরা মত্ত। তাঁরা বস্তুজগতের অতি গভীরে অবতরণ করছেন এবং অনুধাবন করছেন যে বাইরে থেকে বিশেষ কোন বস্তু দেখে যা মনে হয় আসলে তা তাই নয়।

থমসন, রাদার ফোর্ড ও অন্যান্যরা মনে করছেন দৃশ্যমান পৃথিবী তাই 'মায়া' মাত্র এবং এই পার্থিব পৃথিবী পরোক্ষ অ-জড় শক্তির প্রকাশ মাত্র। মিল্‌লিক্যান্ ও জীনস্ মনে করেন যে যেমন যন্ত্রচালক যন্ত্র চালায় তেমন কোন বহিঃশক্তি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে করছেন পরিচালনা। প্রথমোক্ত মত সেই প্রাচীন ভারতের **'মায়াবাদ'** এবং শেষোক্ত মত সেই প্রাচীন ভারতের **'ব্রহ্মবাদ'**। বিজ্ঞান কি তবে দর্শনে করছে অবতরণ! আর সেই দর্শন দেখছি ভারতের। ধন্য, ধন্য ভারতবর্ষ!

—**শ্রীবিশ্ব**

এপ্রিল—১৯৭৫

॥ এক ॥

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঃ জন্ম-সম্পদ—

ভক্তিভাব, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা-প্রীতি ও অঙ্কে আসক্তি ঃ

প্রাচীন 'কাঞ্চনপল্লী'র বর্তমান নাম 'কাঁচড়াপাড়া'। 'কাঁচড়াপাড়া' পূর্ব রেলের একটি নামকরা স্টেশন। এখানকার রেলওয়ে ওয়ার্কশপের জন্য স্টেশনটির এত নাম। এর পরই চব্বিশ পরগণার শেষ এবং নদীয়া জেলার শুরু।

প্রাচীন 'কাঞ্চনপল্লী' ও তার সন্নিহিত অঞ্চল একদিন ছিল ভক্তি, ধর্ম, সংস্কৃতচর্চা ও বঙ্গসাহিত্যের তীর্থস্থল কিন্তু মারাত্মক ম্যালেরিয়ার প্রকোপে এ অঞ্চল হয় পরিত্যক্ত ও জনহীন।

এই অঞ্চলেই একদিন ছিল আজকের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পিতৃপুরুষদের বাড়ি। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে তাঁর বৃদ্ধ-প্রপিতামহের কলকাতার বাসভবনে তাঁরা উঠে আসেন।

এই বসু পরিবারের কাঞ্চনপল্লীর সন্নিহিত হরিণঘাটার কাছাকাছি বড় জাগুলিয়ায় ছিল বাস। বোধহয় তাই প্রাচীন কাঞ্চনপল্লীর ঐতিহ্য—ভক্তিভাব, সংস্কৃত-প্রীতি ও বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ এই পরিবারের হয় সম্পদ। অপ্রাসঙ্গিক হলেও প্রাচীন কাঞ্চনপল্লীর ভক্তি-ধর্ম, সংস্কৃত-চর্চা ও বঙ্গ-সাহিত্য সৃষ্টির আলোচনা অবান্তর নয়।

ভক্তিতীর্থ বৈষ্ণবধাম 'কুলিয়ার পাট' বা 'অপরাধভঞ্জন পাট' এবং কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কেন্দ্র 'ঘোষপাড়া'। কুলিয়ার বৈষ্ণব-নিন্দুক পণ্ডিত দেবানন্দের অপরাধ মার্জনা করেন শ্রীচৈতন্য। সেই ঘটনার স্মৃতি 'কুলিয়ার পাট' আর ঘোষপাড়ায় 'সতীমার পাট' ও আউলচাঁদের ভক্ত কর্তাভজাদের কেন্দ্র।

কাঁচড়াপাড়ায় আজও বিদ্যমান চৈতন্যভক্ত সেন শিবানন্দের পাট আর তাঁর গৃহবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ রায়। সেন শিবানন্দের তৃতীয় বা সর্বকনিষ্ঠপুত্র পরমানন্দ সেন (পুরী দাস) সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন চৈতন্য চরিতামৃত কাব্য, চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক এবং গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা। তাঁকে চৈতন্যদেব কবি 'কর্ণপুর' উপাধি দেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যগুরু স্বভাবকবি ও প্রাচীন সংবাদপত্র 'প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের জীবনব্যাপী বাংলা সাহিত্যের সেবা কোন বাঙালী ভুলতে পারবে না কোনদিন। আর ছিলেন হরিমোহন গুপ্ত ও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। হরিমোহন ছিলেন 'তুলসী রামায়ণ' ও 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এর বঙ্গানুবাদক। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন সাংবাদিক এবং জীবনীকার। তিনি সম্পাদনা করতেন 'আর্যদর্শন' পত্রিকা আর লিখেছেন 'গ্যারিবল্ডির জীবনচরিত', 'ম্যাটসিনির জীবনচরিত' ও 'জন স্টুয়ার্টমিলের জীবনচরিত'।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের গ্রামের নাম 'সুবর্ণপুর'। এর কাছাকাছি বড়জাগুলিয়া গ্রাম—সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পূর্ব পুরুষদের গ্রাম। জন্মভূমির মাটির আঘ্রাণে সত্যেন বসুর পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসু পান ভক্তিভাব, সংস্কৃত-প্রীতি ও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ—যা উত্তরাধিকার সূত্রে সত্যেন বসুর বাল্যজীবনকে করে আচ্ছন্ন কিন্তু সব চেয়ে যার জন্য সত্যেন বসুর জগৎজোড়া নাম সেই অঙ্কশাস্ত্রে আসক্তি তিনি লাভ করেন উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতৃপুরুষ ও মাতৃ-পুরুষদের কাছে। আসুন, একবার অনুধাবন করি সত্যেন বোসের উর্ধতন পাঁচ পুরুষের তালিকা :

মধুসূদন বসু

[পূর্ববঙ্গে সমুদ্রতীরে লবণের ব্যবসায়ী—পরে তান্ত্রিক সাধু।]

↓

দুর্গাচরণ বসু

[কলকাতার বিদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী। ইনিই তৈরী করেন ২২নং ঈশ্বর মিল লেনের বাড়ি—বিধান সরণী (প্রাক্তন

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট)-এর উপরকার স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের ঠিক পিছন দিকটায়।]

↓

শ্যামাচরণ বসু

[উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী।]

↓

অম্বিকাচরণ বসু

[শেষ জীবনে মীরাটে সরকারী হিসাবরক্ষক।]

↓

সুরেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৮-১৯৬৪)

[রেলের হিসাবরক্ষক। সতীশ ব্রহ্মোর সাথে স্থাপনা করেন প্রথম রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান—ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস লিঃ। পত্নী—কলকাতার মেয়ে আমোদিনী বসু (মৃত্যু ঃ ১৯৩৯ সাল)]

↓

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪)

পাঁচ পুরুষ। সকলেরই কারবার—হিসাব-নিকাশের ব্যাপার অর্থাৎ অঙ্কের ব্যাপার। মাতার দিক দিয়েও এই অঙ্ক। সত্যেন বোসের মাতা আমোদিনীর পিতা মতিলাল রায় চৌধুরী অঙ্কে এম. এ. এবং আলিপুর আদালতের একজন বড় উকিল ছিলেন।

পিতার দিক দিয়ে এবং মাতার দিক দিয়ে অঙ্কে আসক্তির জন্যই হয়'ত সত্যেন বসু পুরুষানুক্রমে অর্জিত অঙ্কে আসক্তির উত্তরাধিকারী হন।

বিজ্ঞান সেবায় আত্মত্যাগী। সংসারী কিন্তু আত্মভোলা, খেয়ালী। দেশসেবী ঃ সর্বোপরি চিন্তায়, আচারে, মননে নির্ভেজাল। জীবনের বড় কীর্তি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার।

এই আদর্শ-জীবনের সঙ্গিনী—উষা! বিবাহ ঃ বয়স যখন কুড়ি বৎসর ১৯১৪। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে যখন তিনি পড়ছেন এম. এস-সি।

জীবন সঙ্গিনী—উষা : কলকাতার কম্বুলিয়াটোলার ডাক্তার যোগীন্দ্রনাথ ঘোষের একমাত্র কন্যা।

পাঁচ কন্যা, দুই পুত্র : মোট সাতটি সন্তান-সন্ততি : বয়সানুক্রমে তাঁদের নাম ও পরিচয় :—

১। নীলিমা (কন্যা)—স্বামী রবীন্দ্র মিত্র (মৃত) : পুত্র কমল ও নওয়াল,

২। পূর্ণিমা (কন্যা)—স্বামী অরুণ রায় (কুলটি আয়রণ ওয়ার্কস-এর ডাক্তার) : পুত্র অসীম,

৩। জয়া (কন্যা)—স্বামী দেবপ্রসাদ চৌধূরী (হাইকোর্টের আইন ব্যবসায়ী : পুত্র রঞ্জন,

৪। শোভা (কন্যা) :

৫। রথীন্দ্র (পুত্র)—বিবাহিত। কলকাতার একটি বিদেশী কোম্পানীর ইন্‌জিনিয়ার,

৬। অর্পণা (কন্যা)—বর্তমানে অবিবাহিতা ও মার্কিন মুলুকে পাঠরত,

৭। রমেন্দ্র (পুত্র)—প্রথম বিভাগে বিদ্যুৎ-ইনজিনিয়ারিং গ্রাজুয়েট ও মার্কিন মুলুকে পাঠরত।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু : জ্ঞান-সম্পদ—শিক্ষা, গবেষণা এবং অধ্যাপনা। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সত্যেনের মনীষা ও মনন শিক্ষার দীপ-শিখায় নবরূপে নব-গরিমায় উদ্দীপ্ত হ'ল। পিতা সুরেন্দ্রনাথের বয়স যখন ছাব্বিশ তখন তাঁদের কলকাতার ২২নং ঈশ্বর মিল লেনের বাড়িতে সত্যেন জন্মগ্রহণ করেন—১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী। পিতা-পুত্রের বয়সের পার্থক্য ছাব্বিশ।

সত্যেন পিতামাতার প্রথম সন্তান ও একমাত্র পুত্র। সত্যেনের ভাই ছিল না, ছিল শুধু ছয় বোন। এই বোনদের নাম—স্নেহলতা, আশালতা, কনকলতা, খুঁদি, তরুলতা ও বিদ্যুৎ।

একটি মাত্র ছেলে—তাই এঁর শিক্ষার উপর পিতামাতা দু'জনার

ছিল সতর্ক দৃষ্টি এবং অকুণ্ঠ চেষ্টা। মাতা আমোদিনীর কাছে সত্যেন পেয়েছিলেন অফুরন্ত আদরের সাথে হাজার রকমের সদুপদেশ। পিতা স্থরেন্দ্রের ছিল সংস্কৃত ভাষায় দখল, গণিতের প্রতি আকর্ষণ ও কর্মপ্রচেষ্টার উদ্যোগ। সত্যেন পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন এই তিনটি গুণ। গৃহশিক্ষার পর তাঁর স্থরু হয় শিক্ষায়তনের শিক্ষা।

নিম্নে তাঁর শিক্ষাজীবনের বিবরণ দেওয়া হ'ল ঃ

নর্মাল স্কুল (জোড়াবাগান)-১৮৯৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যেনের চেয়ে বত্রিশ বছরের বড়। তিনি ছোট বেলায় এই স্কুলে পড়েছিলেন কিছুদিন। 'ছেলেবেলা' বইতে তিনি এই স্কুল সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন। সত্যেন যখন এই স্কুলে ভর্তি হন তখন তাঁরা ভাড়া বাড়িতে ছিলেন। ঈশ্বর মিল লেনের বাড়ির চেহারা আজকের মত ছিল না। বর্তমান রূপ দিয়েছেন সত্যেনের বাবা। তখন এটা ছিল ছোট একটা বাড়ি।

কলকাতায় স্থরেনবাবুর সংসার ক্রমশঃ বাড়ছিল। এ বাড়িতে কুলায় না। তারপর বাড়িতে ছিলেন একজন ভাড়াটে। তাঁকে তোলা হ'ল শক্ত। নিমতলায় ছোট একটা বাড়ি ভাড়া করে সেখানে বাসা বাঁধলেন সত্যেনের বাবা।

এই অঞ্চলে ছিল জোড়া বাগানের নর্মাল স্কুল। সেখানে সত্যেনকে ভর্তি করে দেওয়া হ'ল। সেটা ১৮৯৮ সনের কথা।...

পরে আবার বাসা বদল হ'ল। দর্জিপাড়ার এক সরুগলির একটা ছোট বাড়ি। তারপর ২২ ঈশ্বর মিল লেনের বাড়ি। তখন ভাড়াটেও উঠেছেন। বাড়ির চেহারাও বদলাচ্ছে। ঈশ্বর মিল লেনের বাড়ি স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের পিছনটায়। কাছেই কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট (বর্তমানে বিধান সরণী)-এর উপর নিউ ইণ্ডিয়া স্কুল। এই স্কুলেই ভর্তি হলেন সত্যেন।

নিউ ইণ্ডিয়া স্কুল (কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট বর্তমানে বিধান সরণী)

[১৮৯৯—১৯০৭]

সত্যেন যখন সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র (১৯০৭) তখন তিনি হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন।

হিন্দু স্কুল (কলেজ স্কোয়ার)—[১৯০৭-১৯০৯]

হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক তখন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ রসময় মিত্র এবং গণিতের শিক্ষক উপেন্দ্রলাল বক্‌সি। গণিতে সত্যেনের মেধা দেখে উপেনবাবু গণিতের পরীক্ষায় মোট একশো নম্বরের মধ্যে তাঁকে দিয়েছিলেন একশো দশ নম্বর। কারণ সত্যেন একাধিক পদ্ধতিতে কষেছিলেন কয়েকটি অঙ্ক। উপেনবাবু বলেছিলেন—কালে সত্যেন **Laplace** ও **Cauchy**-এর মত গণিতবিদ্ হবে।

১৯০৯ সালের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সত্যেন পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। প্রথম হয়েছিলেন জামতারা স্কুলের ছাত্র রাধারমণ সিংহ আর দ্বিতীয় হয়েছিলেন সত্যেনের হিন্দুস্কুলের সতীর্থ চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। পরবর্তীকালে এঁদের কথা আর শোনা যায়নি।

প্রেসিডেন্সি কলেজ : ১৯০৯-১৯১১।

বিষয়—আই. এস-সি : অতিরিক্ত বিষয়—ফিজিওলজি :

সাহিত্যে—বিশেষতঃ ইংরাজী সাহিত্যে সত্যেনের বিশেষ মেধা থাকলেও তিনি বিজ্ঞান বিষয় নির্বাচন করলেন। কারণ বিজ্ঞানের বিভাগ তখন নূতন চালু হচ্ছে। ইংরাজী সাহিত্যে তাঁর এতটা কৃতিত্ব ছিল যে ইংরাজীর কড়া অধ্যাপক পার্সিভাল তাঁকে ষাট নম্বর দিয়ে সেই সঙ্গে বাড়তি দশ নম্বর দিয়েছিলেন। তা ছাড়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের দৃষ্টি পড়ে তাঁর উপর।

শেষ পরীক্ষায় সত্যেন প্রথম স্থান অধিকার করেন। দ্বিতীয় স্থান পান মানিক দে, তৃতীয় স্থান পান মেঘনাদ সাহা, চতুর্থ স্থান পান জ্ঞান ঘোষ এবং পঞ্চম স্থান পান প্রাণকৃষ্ণ পারিজা। প্রশান্ত মহলানবীশ (পরবর্তীকালে পরিসংখ্যানবিদ্ ও ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা) ও প্রফুল্ল ঘোষ (পরবর্তীকালে

পশ্চিম বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী) ভালভাবে পরীক্ষোত্তীর্ণদের মধ্যে ছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট সায়েন্সে সত্যেনের সহপাঠীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

স্থরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু নির্বেদানন্দ; জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে খনিজ কর্দম (**Clay mineral**)-এর বিজ্ঞানী ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি।

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। স্যার উপাধি প্রাপ্ত। স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য। ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি। এঁর আবিষ্কার ঃ ঘোষবিধি। বর্তমানে পরলোকগত।

প্রাণকৃষ্ণ পারিজা। পরবর্তীকালে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি।

ইণ্টারমিডিয়েট সায়েন্সের শেষ পরীক্ষায় প্রথম 'সত্যেন' গণিতেও হন প্রথম এবং সাহিত্য বিষয়গুলোর নম্বরের যোগফলও হয় সব চাইতে বেশী। এবার বি. এস-সি ও এম. এস-সি।

প্রেসিডেন্সি কলেজ ঃ ১৯১১-১৩ ; ১৯১৩-১৫

বিষয়—ফলিত অঙ্ক শাস্ত্রে বি. এস-সি অনার্স ও এম. এস-সি।

মেঘনাদ সাহা ঢাকা থেকে এসে ফলিত অঙ্ক শাস্ত্রে বি. এস-সিতে ভর্তি হন এবং সত্যেন বসুর সহপাঠী হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে থাকেন। তু'জনারই পণ—বিজ্ঞান-সাধনায় জীবনব্যাপী তপস্যা। তুটোর ও শেষ পরীক্ষায় সত্যেন হন প্রথম ও মেঘনাদ হন দ্বিতীয়। সত্যেন প্রত্যেক পত্রে শতকরা ৯২-৯৩ নম্বর পান। সত্যেন যে নম্বর পান সে নম্বর এ পর্যন্ত আর কোন ছাত্র এ পরীক্ষায় পাননি।

উত্তর কলকাতার ছাত্রদের উদ্দীপনা সত্যেনের ছাত্রজীবনের এই অভূতপূর্ব কীর্তি—সেদিন এবং আজও।

পঠদ্দশায় সত্যেনের বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়—বিশেষতঃ জৈব-রসায়নে কিছুটা দখল জন্মায়। মেঘনাদও ছিলেন তাঁরই মতন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারী এই দুই ছাত্র বিজ্ঞানের কাজে দিলেন হাত। সত্যেন ও মেঘনাদ এক সাথে অনুবাদ করেন 'মিন্স কাউসকি'র 'রিলেটিভিটি' এবং 'থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স' ও 'অ্যাস্ট্রোফিজিক্স'। সত্যেন-মেঘনাদের নাম পরবর্তীকালে এই দুই বিষয়ে হয় বিশ্ববিখ্যাত।

পাঠ বহির্ভূত পাঠে সত্যেনের ছিল বিশেষ আকর্ষণ। বি, এস-সি পড়ার সময় তিনি পড়ে শেষ করেন Routh-এর Particles Dynamics ও Rig d Dynamics. পরমাণুর পর্যায়—সারণী রচয়িতা মেণ্ডেলিফের রসায়নের দুটি ভ্যলুমও তিনি পড়ে ফেলেন।

* * *

বাংলায় 'বিদ্যা' সম্বন্ধে একটি ছড়া আছে ঃ

এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে,
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।

কথাটা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য। শিক্ষায়তনের শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যতটা না হয় গবেষণা ও অধ্যাপনায় তার চেয়ে অনেক বেশী হয় এবং বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বিজ্ঞানীর চোখে ও মনে ধরা পড়ে। সত্যেন ও মেঘনাদ একথা ভালভাবেই জানতেন। তাই তাঁরা গবেষণা ও অধ্যাপনার জন্য হলেন উন্মুখ।

সুযোগও এসে গেল। সেই কথা এখন বলি।

গবেষণা ও অধ্যাপনা

স্থান ঃ কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজ

[University college of science and Technology]

স্থাপনা ঃ মার্চ ২৭, ১৯১৪

এই আলোচনায় কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ সৃষ্টির উল্লেখ না করলে আলোচনা হবে অসম্পূর্ণ। অতএব সেই আলোচনায় অভিনিবেশ কাম্য।

১৯১৪ সনের আগে প্রেসিডেন্সি কলেজে এম. এ ও এম. এস-সি পড়ান হ'ত এবং তাও আবার সামান্য কয়েকটি বিষয় নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মাত্র পরীক্ষক সংস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আন্দোলনের ফলে প্রেসিডেন্সি কলেজ বি. এ ও বি. এস-সি পর্যন্ত পড়াবার ভার নিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকদের উচ্চতর কলা ও বিজ্ঞান পড়াবার ভার নিল। উচ্চতর বিজ্ঞানের কলেজ স্থাপনার জন্য আশুতোষের চেষ্টায় বিখ্যাত বাঙালী আইনজীবি তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষ দিলেন জমি, বাড়ি ও টাকা। তৈরী হ'ল পার্শিবাগানে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ—ঠিকানা ৯২নং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড (পূর্ব নাম আপার সারকুলার রোড) ঃ বাঙালীর চিরন্তন এক মহান্ সম্পদ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বাঙালীর নবজাগরণের গৌরবোজ্জ্বল যুগ। ধর্মসংস্কারে, নব সাহিত্যের সৃষ্টিতে, স্বাদেশিকতায়, রাজনৈতিক মুক্তি-যজ্ঞে এবং বিজ্ঞান-সাধনায় ও নবকর্মের উন্মাদনায় বাঙালী সেদিন চঞ্চল। বিজ্ঞান সাধনায় সেদিন এসেছে এক নূতন যুগ। বাঙালীর বিজ্ঞানচর্চার জন্য গবেষণাগার ছিল না। প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণার ব্যবস্থা অতিমাত্রায় ছিল নগণ্য।

বৌবাজারের ছানাপটিতে Indian Association for the Cultivation of Science নামক গবেষণাগার স্থাপনা (১৮৭৬) করে সুবিখ্যাত আদি বিজ্ঞান-প্রেমিক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বিজ্ঞানের ছাত্রদের গবেষণার ব্যবস্থা করে দেন। এখানে গবেষণা করে রমন আবিষ্কার করেন আলোক বিচ্ছুরণ (X' Ray) এবং 'নোবেল' প্রাইজ পান (১৯৩০)।

কম শিক্ষিত ইংরেজ বিজ্ঞানীদের অধীনস্থ অধ্যাপক হয়ে এবং ইংরেজের নানান্ বিভেদ নীতির শিকার হয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দিনরাত খেটে নূতন নূতন আবিষ্কার ও রচনায় পৃথিবীতে আনলেন চমক।

আর সেদিন উঠছেন নূতন কৃতী বিজ্ঞানের ছাত্র সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্র মুখার্জি, প্রাণকৃষ্ণ পারিজা, প্রশান্ত মহলানবীশ এবং আরও অনেকে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় তরুণদের একান্ত আগ্রহে আশুতোষের চেষ্টায় এঁরা এই নূতন বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা ও অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হলেন।

সত্যেন হলেন রিসার্চ স্কলার (১৯১৬)। তাঁর গবেষণার বিষয়— Relativity অর্থাৎ আপেক্ষিকবাদ। পর বৎসর ১৯১৭ সালে তিনি হলেন বিজ্ঞান কলেজের গণিত ও পদার্থ বিদ্যার লেকচারার।

আর মেঘনাদ সাহার পড়ানোর বিষয়ঃ Theory of Radiation অর্থাৎ বিকিরণ তত্ত্ব।

জার্মানে সেদিন নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক চিন্তার আলোড়ন। নূতন বিজ্ঞানীরা শিক্ষা দিতে দিতে শিখতে লাগলেন নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। জার্মান বিজ্ঞানী Planck-এর বই জার্মান ভাষাতে লেখা। তা আয়ত্ত করবার জন্য সত্যেন-মেঘনাদ শিখলেন জার্মান ভাষা। আপেক্ষিকবাদ ছাত্রদের মধ্যে প্রচারের জন্য দু'জনায় লিখলেন ইংরেজী

ভাষায় বই। ভূমিকা লিখলেন প্রশান্ত মহলানবীশ। ছাপলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯১৭-২১ পর্যন্ত চার বছর কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে চললো সত্যেনের অধ্যাপনার মাধ্যমে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সংগ্রহ। ১৯২১ সন। পদার্থ বিজ্ঞানের রীডার হয়ে সত্যেন বসু চললেন সদ্য স্থাপিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে তাঁর অধ্যাপনা—২৪ বৎসর ঃ ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত।

জার্মান বৈজ্ঞানিক **Planck**-এর বইতে অভিনিবেশ এখানে হ'ল ফলবতী। সৃষ্টি হ'ল যুগান্তকারী 'বোস-সংখ্যায়ন'—১৯২৪। যার জন্য সত্যেন বসুর নাম আজ জগৎজোড়া।

'বোস-সাংখ্যায়ন' কঠিন তত্ত্ব।

॥ দুই ॥

বোস সংখ্যায়ন (১৯২৪)

আমরা গল্প উপন্যাস পড়তে ভালবাসি—বিশেষতঃ আধুনিক চলতি গল্প ও উপন্যাস। হাল্‌কা জিনিষ। বোঝবার জন্য কষ্ট করতে হয় না কিন্তু বিজ্ঞানতত্ত্ব তা নয়! বিজ্ঞানে কিছু জ্ঞান না থাকলে এবং অজানাকে জানবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা না থাকলে এতে আমাদের মন বসবে না। আজকালকার আধুনিক বাংলার একশ্রেণীর কবিতা বার বার পড়লেও যে ধোঁয়া সেই ধোঁয়া থেকে যায়—বিজ্ঞানও হবে তেমনি যদি না বিজ্ঞানের গোড়ার কথা জানা থাকে আর যদি না থাকে জানবার অদম্য চেষ্টা।

'বোস-সংখ্যায়ন' ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সত্যেন বোসের সৃষ্টি। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এটি রচিত হয় ও আইনষ্টাইনের সৌজন্যে ইহা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে স্বীকৃত, গৃহীত ও ব্যবহৃত হয় এবং বিজ্ঞান জগতে

এখন ইহা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি দীর্ঘ নীরবতার পর ১৯৫৭ সালে 'বোস-সংখ্যায়ন'কে দিয়েছেন স্বীকৃতি এবং 'বোস-সংখ্যায়ন'-এর জনক সত্যেন বোসকে তাঁদের "ফেলো" নির্বাচিত করেছেন।

'বোস-সংখ্যায়ন' সম্পর্কে পত্রিকায় কিছু কিছু লেখা বার হয়েছে এবং হচ্ছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতের উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রের ডঃ মহাদেব দত্ত 'বোস-সংখ্যায়ন' নিয়ে বই লিখেছেন। 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৫৭) বিজ্ঞান লেখক গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের বোস-সংখ্যায়ন সম্পর্কীয় প্রবন্ধ সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য।

'পরিচয় গোষ্ঠি'র প্রধান এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবসায়ী 'আডেয়ায় দত্ত' কোম্পানীর কর্ণধার গিরিজাপতি ভট্টাচার্য ছিলেন সত্যেন বোসের বাল্যবন্ধু। "সতেন্দ্রনাথ বসু ও নব্য বিজ্ঞান" সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তিনি 'বোস-সংখ্যায়ন'-এর উপর লিখেছেন ঃ

> …যেখানে একের বদলে বহুর সমাবেশ সেখানেই ব্যষ্টিগত আচরণের পরিবর্তে সামষ্টিক আচরণেরই প্রাধান্য। বহু একত্রিত হয়ে যে সমষ্টি উৎপন্ন করে তা পৃথক এক সত্তা ও পৃথক লক্ষণাদি লাভ করে, যা ব্যষ্টিতে অবর্তমান ও যা ব্যষ্টিগুলির লক্ষণ আচরণাদির যোগফল মাত্র নয়। সমষ্টিতে যা প্রকটিত, ব্যষ্টিতে তা অপ্রত্যাশিত এমন কি নিরর্থক। প্রকৃতপক্ষে ব্যষ্টি ও সমষ্টির তাৎপর্য বিভিন্ন।
>
> এক ও বহু, ব্যষ্টি ও সমষ্টি, সামান্য ও সমূহ—এদের মধ্যে তাৎপর্যের বিভিন্নতা জগতের প্রাচীন মনীষীরা উপলব্ধি করেছিলেন। উপনিষদের ঋষিরা বলেছিলেন—ভূমাকে জানো, তবেই জ্ঞানের আনন্দ সম্যক হবে—"ভূমাত্বের বিজিজ্ঞাসিতব্য" বিশ্বকে টুকরো টুকরো করে জানলে জ্ঞান সার্থক হবে না, তার নিরতিশয় বা সম্পূর্ণ অখণ্ড রূপ ও সত্তার যে ভিন্ন তাৎপর্য

আছে তাকেও জানা চাই। বহুর সমাবেশ বা সমন্বয় যে বিশেষ একটা নির্দেশ আছে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে নিত্যই তার পরিচয় পাই। সমাজ, রাষ্ট্র, কৃষি, স্বাস্থ্যবিভাগ প্রভৃতির ব্যবস্থায় ইন্‌সিয়োরেন্স জন্ম-মৃত্যু ও প্রজনন সংক্রান্ত ব্যাপারে, জুয়ার হারজিতে তাস (**flush**), পাশার দানে, টার্গেট শুটিঙে, ঘোড়দৌড়ের ফলাফলে সমষ্টিগত বিবিধ নিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়। সমষ্টির নিয়ন্ত্রণ অবিসংবাদিত ভাবে আমাদের সকল রকম অনুষ্ঠানে ও উদ্যোগের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

স্বনামধন্য প্রফেসার প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ সমষ্টিগত বিধি-লক্ষণের অনুশীলন অধ্যয়নাদি ও গবেষণার জন্য বরানগরে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছেন তা আজ দেশবিদেশে প্রখ্যাত।

……সমাজ ও রাষ্ট্রে বা কৃষ্টি বা তাশপাশায় যেমন, পদার্থবিজ্ঞানেও তেমনি সামষ্টিক বিধির আধিপত্য। একটা রুল হাতে নিয়ে দেয়ালে লাগিয়ে মনে করলাম রুলটা ঠেকে গেছে—কি না স্পর্শ করেছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, রুলটা কোটি কোটি অণুর সমষ্টি ; অণুও তার অন্তর্গত পরমাণুগুলিতে আছে ঝাঁকে ঝাঁকে সহস্র সহস্র ইলেকট্রন-প্রোটনাদি। ব্যষ্টিকভাবে রুলের ও দেওয়ালের কোন্ বা ক-টা ইলেকট্রন-প্রোটন পরস্পরকে স্পর্শ করেছে বলা অসম্ভব ও অর্থহীন। রুল ও দেওয়ালের স্পর্শলাভে একটা সামষ্টিক ব্যাপার। শত সহস্র কোটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলকণার সমষ্টি হ'ল মেঘ ; আবার প্রায় সহস্র কোটি নক্ষত্রের সমাবেশ হ'ল একটা নক্ষত্রমণ্ডল, যাকে আমরা বলি নীহারিকা। যে রকম ঘরে আমরা বাস করি তার বায়ুতে আছে কোটি কোটি অক্সিজেন-নাইট্রোজেন অণু। এ সকলের যে সব আচরণ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা সামষ্টিক আচরণ, ব্যষ্টিক নয়।

ধরা যাক, ঘরের মধ্যে যে বায়ু আছে তার টেম্পারেচার অবিদিত নেই, গ্যাস হ'ল অতি দ্রুত বেগবান অণুর সমাবেশ। টেম্পারেচার হ'ল তার সামষ্টিক গত্যঙ্ক। কিন্তু যদি বলা যায়, একটি বা গুটিকয়েক অণুর টেম্পারেচার তবে তা অর্থহীন। আবার, অণুদের গতি জানা থাকলেও টেম্পারেচার নির্ণয় সম্ভব নয়। কল্পনা করা যেতে পারে যে, প্রত্যেকটি অণুর গতিবিধি নির্ণয় করে তা থেকে টেম্পারেচার অবগতির একটা উপায় হতে পারে; কিন্তু তাতে আয়ু নিঃশেষ হবে। অতএব অন্য পথের সন্ধান চাই।

সমস্যাটির উদয় হয়েছিল বৈজ্ঞানিক মহলে উনিশ শতকের গোড়ায়। ইতিপূর্বে কয়েক শতাব্দী আগেই **গ্যালিলিয়ো, নিউটন** প্রভৃতি মনীষীরা **ব্যষ্টির স্থিতি, কক্ষ ইত্যাদির গণিত** রচনা করেছিলেন। পৃথিবী ও গ্রহের গতিবিধি, গ্রহণ ইত্যাদির, কামানের গোলা, বিলিয়ার্ড বল ও রাইফেল-বুলেটের অঙ্ক কষে ফলাফল বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু মুশকিল হ'ল গ্যাস নিয়ে।

ইতিমধ্যে ষ্টিম চালিত ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ষ্টিমের ব্যাপার নিয়ে বিজ্ঞানীরা আলোচনায় রত হলেন, কিন্তু ব্যষ্টি এতে অচল। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল ও ক্লসিয়াস লাগলেন সামষ্টিক গণিত নির্ণয় কষতে। **ম্যাক্সওয়েল** অণুদের গতির বণ্টন বলে দিলেন সমষ্টি-গণিত প্রয়োগ করে। **সমষ্টি-গণিত** এই থেকে প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

বিজ্ঞানীরা বুঝলেন, শুধু নিউটনের গণিতই যথেষ্ট নয়; পদার্থ বিজ্ঞানে চাই সমষ্টি-গণিত। গ্যাসের অন্যান্য আচরণ ও **Radiation** বা বিকিরণ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা সমাধানে লাগলেন লর্ড রেলে, বোল্টজম্যান, উইন্‌স প্রভৃতি এই নবপর্যায়ের গণিত প্রয়োগ করে। অবশেষে **প্লাঙ্ক (Planck)** তাকে অঙ্কগত করলেন ও তা করতে গিয়ে একটা সম্পূর্ণ নূতন অভিনব

সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। সে হ'ল Quantum Theory; **শক্তির কণাবাদ**, যেমন বস্তুর। অর্থাৎ শক্তিপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন শক্তি নয়; নদীপ্রবাহ যেমন জলকণার স্রোত, শক্তিপ্রবাহ তেমনি শক্তিকণার স্রোত।

প্লাঙ্ক যেভাবে **সমষ্টির** অঙ্ক প্রয়োগ করলেন তা বিজ্ঞানের চক্ষে ত্রুটিহীন ও অনাপত্তিজনক হয় নি। **১৯২৪ অব্দে সত্যেন্দ্রনাথের যে গবেষণা** প্রকাশিত হ'ল তাতেই অভিনব ও স্বপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তিতে ত্রুটি ও আপত্তিহীনভাবে Planck Law-এর প্রমাণ সিদ্ধ হ'ল। এই গবেষণাটির বিষয়বস্তু ছিল আলোক-কণা বা ফোটন (Photan) ও বিকিরণ (Radiation)-এর সামষ্টিক আচরণ।

কিন্তু আইনষ্টাইন বললেন, শুধু ফোটন কেন এমন কি বস্তুকণার সমষ্টিতেও **বোস সংখ্যায়ন**-বিধি প্রযোজ্য। তিনি স্বয়ং একে প্রয়োগ করলেন ইলেক্‌ট্রন-গ্যাসের আচরণ সমাধানে। ম্যাক্সওয়েল ও ক্লসিয়াস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো গ্যাস-অণুদের সামষ্টিক-বিধি, এবার প্রতিষ্ঠিত হ'ল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সকল কণাসমষ্টির সামষ্টিক-বিধি—আলোককণা, বিকিরণ, ইলেকট্রন-কণা ইত্যাদি। পদার্থ বিজ্ঞানে সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক একটা নূতন অধ্যায় যোজিত হ'ল।

বোস-সংখ্যায়নকে আইনষ্টাইন ইলেকট্রন-গ্যাসে ব্যবহার করলেও দেখা গেল কার্যক্ষেত্রে এর প্রয়োগ খুব সফল হয় না। বস্তুত সব বস্তুকণাই বোস-সংখ্যায়ন নিয়ন্ত্রিত নয়; যে সব বস্তুকণা বোস-সংখ্যায়ন অনুসরণ করে তারা অপর এক সংখ্যায়নের অধীন।

সত্যেন্দ্রনাথের পদানুসরণ ক'রে ফার্মি ও ডিরাক (Fermi-Dirac) দু'বছর পরে এই সংখ্যায়ন প্রস্তাব

করেন। এই উভয় সংখ্যায়নই এখন Atomic ও Quantum Mechanics-এ গ্রাহ্য।

পদার্থ বিজ্ঞানে যে সকল প্রাথমিক কণিকা স্বীকৃত ও বিবৃত হয়েছে তারা দুই দলে বিভক্ত। একদল বোস-বিধির অনুবর্তী। এদের নামকরণ হয়েছে "বোসন"।

অপর দল ফার্মি-ডিরাক বিধি ও Pauli's Exclusion Principle-এর অনুবর্তী। এদের নামকরণ হয়েছে "ফার্মিয়ন"।

ফোটন, কোয়াণ্টাম ও যুগ্ম সংখ্যক ভর-সমন্বিত কণিকারা, যথা অ্যালফা-কণা, কয়েকটি মেসন ইত্যাদি প্রথম দল (বোসন)-এর অন্তর্গত; ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি অযুগ্ম সংখ্যক ভর-সমন্বিতরা দ্বিতীয় দল (ফার্মিয়ন)এর অন্তর্গত।

নব্যবিজ্ঞানের জয়যাত্রা চতুর্দিকে শুরু হল। এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের 'বোস-সংখ্যায়ন'। কেবল ৬টি প্লাঙ্ক-অঙ্ক (Planck's Law) ও শক্তিকণা প্রতিষ্ঠিত করবার স্বাধীন সোপান স্বরূপ হয়নি। ও এনে দিল নব্যবিজ্ঞানে, 'Atomic Physics ও Quantum Mechanics-এ সমষ্টির সূত্র। বিজ্ঞানে, যেমন অন্যত্র, সামষ্টিক সূত্র অপরিহার্য। সে বিজ্ঞান অচল যাতে সমষ্টির আসন নেই। নব্যবিজ্ঞানের এই অপরিহার্য অধ্যায়টি রচনা করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ।

॥ বোস-সংখ্যায়ন ও আইনষ্টাইন ॥

জার্মান বৈজ্ঞানিক প্লাঙ্কের প্রকল্পে বিকিরণ (**Radiation**) নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ নয়—ইহা কণিকা সমষ্টি ; পদার্থ কণিকা নয়। ইহা শক্তি কণিকা বা **Quanta.**

এরই সাহায্যে প্লাঙ্ক তৈরী করলেন তাঁর সূত্র কিন্তু পদ্ধতি-তাত্ত্বিক আচারপুষ্ট এবং তজ্জন্য আপত্তিকর।

আইনষ্টাইন প্লাঙ্ক সূত্রকে আচারনিষ্ঠ করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

সত্যেন বসু প্লাঙ্ক সূত্র প্রতিষ্ঠায় যে অঙ্কপাত করলেন তাই হ'ল সর্বদুষ্টতাহীন এবং আইনষ্টাইন ও অন্যান্য পদার্থ বিজ্ঞানীরা দিলেন তাতে স্বীকৃতি। সত্যেন বসুর অঙ্কপাত সৃষ্টি করল প্রথম **কোয়ানটাম সংখ্যায়ন**।

বোস-সংখ্যায়ন প্রণয়নে সত্যেন বসুকে প্রেরণা দেন ডাঃ মেঘনাদ সাহা। পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত সমস্যা আলোচনাকালে ডাঃ সাহা প্লাঙ্ক সূত্র (**Planck's Quantum Theory—1900**)-কে স্বনির্ভর সংখ্যায়নের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সত্যেন বসু সে কার্যের ভার গ্রহণ করে এর সংখ্যায়ন উদ্ভাবন করেন। তখন সত্যেন বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কাল—১৯২৪ সাল।

লণ্ডনের 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন' বিজ্ঞান-বিষয়ক বিখ্যাত পত্রিকা। এই পত্রিকায় ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয় মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন বসুর যৌথ লেখা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব "সাহা বোস ইকুয়েশন অফ্ ষ্টেট" এবং ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয় সত্যেন বসুর 'Energy Spectrum' প্রবন্ধ।

প্লাঙ্কের সূত্রের উপর সত্যেন বসুর সর্বত্রুটিতাহীন কাজ ও সংযোজনে তৈরী '**বোস-সংখ্যায়ন**' তিনি ঐ কাগজে প্রকাশনার জন্য পাঠালেন কিন্তু উক্ত পত্রিকা এবার নীরবতা অবলম্বন করায় **বোস-সংখ্যায়নের** মূল কপি প্রকাশিত হ'ল না।

তখন তিনি এর কপি জার্মান বৈজ্ঞানিক বিখ্যাত আইনষ্টাইনের নিকট একখানি পত্রসহ পাঠালেন। পত্রখানি ইংরাজীতে লেখা ও তার বয়ান নিম্নরূপ :

Respectable Sir, I have ventured to send you the accompanying article for your perusal and opinion. I am anxious to know what you think of it. You will see that I have tried to deduce the coefficient in Planck's Law independant of classical electro-dynamics, only assuming that the ultimate elementary region in the phase space has the content h3. I do not know sufficient German to translate the paper. If you think the paper worth publication I shall be grateful if you arrange for its publication in Zeit Schrift Fur Physick. Though a complete stranger to you, I do not feel any hesitation in making such a request. Because we are all your pupils though profiting only by your teaching through your writings.

বাংলা অর্থ :

সম্মানীয় সুধী, আমি সাহস করে এই পত্রের সাথে একটি প্রবন্ধ আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। আশা করি প্রবন্ধটি পড়ে আপনি আপনার মত জানাবেন। আপনি প্রবন্ধটি সম্বন্ধে

কি মনে করেন তা জানবার জন্য আমি উদগ্রীব। এই প্রবন্ধে আপনি দেখতে পাবেন যে আমি প্রাচীন বৈদ্যুতিক গতিতে নিরপেক্ষ থেকে স্বতঃ প্রতিষ্ঠায় প্লাঙ্ক তত্ত্বের গুণক বার করবার চেষ্টা করেছি। এই প্রচেষ্টায় আমি ধরে নিয়েছি আলোকিত স্থানের মূলগত প্রাথমিক অঞ্চলের পরিমাণ *h3*। আমি ভালো জার্মান জানি না এবং তজ্জন্য প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করতে পারি নি। আপনি যদি মনে করেন প্রবন্ধটি প্রকাশনাযোগ্য তা হ'লে আপনি এটা **Zeit Schrift Fur Physik** পত্রিকায় ছাপাবার ব্যবস্থা করবেন এবং তজ্জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকবো। যদিও আমি আপনার নিকট অপরিচিত—তবুও আপনার নিকট এরূপ অনুরোধ জানাতে দ্বিধা করি নি কারণ আমরা আপনার ছাত্র, যদিও আমরা আপনার শুধু রচনা পড়ে শিক্ষালাভ করে লাভবান হয়েছি।

আইনষ্টাইন প্লাঙ্ক সূত্রকে আচারনিষ্ঠ করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তিনি সত্যের বসুর পদ্ধতিতে এতদূর মুগ্ধ হলেন যে তিনি **বোস-সংখ্যায়ন**'-এ স্বীকৃতি জানিয়ে সত্যেন বসু প্রেরিত 'বোস-সংখ্যায়ন' প্রবন্ধ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করলেন ও প্রকাশনার জন্য জার্মান বিজ্ঞান পত্রিকা **Zeit Schrift Fur Physik**-এ পাঠালেন। সেই সঙ্গে আইনষ্টাইন একটি ক্ষুদ্র টীকা সংযোজিত করলেন। টীকা ইংরাজীতে নিম্নরূপ:

Bose's derivation of Planck's formula signifies, in my opinion, an important step forward. The method used here gives also the Quantum Theory of an ideal gas, as I shall show it else where.

বাংলা অর্থ :

> আমার মতে প্লাঙ্কের সূত্রের উপর বোসের কাজ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাঁর ব্যবহৃত পদ্ধতিতে আমরা পাচ্ছি একটি আদর্শ গ্যাসের কোয়ানটাম তত্ত্ব—যা আমি অন্যত্র দেখিয়ে দেবো।

আইনষ্টাইন সমর্থিত ও অনূদিত 'বোস-সংখ্যায়ন (১৯২৪)' পদার্থ বিজ্ঞানের জগতে হ'লো স্বীকৃত ও সম্বর্ধিত। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান লেখক গিরিজাপতি ভট্টাচার্য লিখেছেন (জ্ঞান ও বিজ্ঞান—মার্চ ১৯৭৪) :

> আইনষ্টাইন সত্যেন্দ্রের গবেষণাটি পড়ে বললেন যে, নতুন পদ্ধতিটি শুধু কোয়াণ্টা নয়, অন্যান্য কণিকা-সমষ্টিতেও লাগানো যায়—যে হিলিয়াম গ্যাসেও তা তিনি অন্যত্র দেখাবেন। পদার্থবিদ্যার একটা নতুন পথ উন্মুক্ত হলো, নতুন রাজ্যে প্রবেশ করবার।
>
> অনেক নব নব কণিকার দল পদার্থবিদ্‌দের দ্বারে এসে আঘাত হানছিল। ইলেট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, ডয়টেরন প্রভৃতি, তা ছাড়া নৈসর্গিক কণিকারা—মেসন, **n**-মেসন প্রভৃতি পদার্থবিদেরা দেখলেন সকল কণিকাই একমাত্র বোস-সংখ্যায়ন অনুবর্তন করে না। বোস-সংখ্যায়ন প্রণয়ন করবার সময় সত্যেন্দ্র লক্ষ্য করলেন যে, আলোক কোয়াণ্টারা অভিন্ন, একটিকে অপর থেকে পৃথক করবার উপায় বা চিহ্ন নেই। ভিন্ন ভিন্ন কোয়াণ্টার চিহ্ন থাকলে তাদের ভিন্ন প্রকোষ্ঠে স্থান দিয়ে চিহ্নিত করা যায়। আলোক-কোয়াণ্টার ক্ষেত্রে সে সুযোগ অবর্তমান।
>
> পরে পদার্থবিদেরা দেখলেন যে, অন্যান্য কণিকার বেলায় যেমন ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভেদ চিহ্ন আছে। সে হলো **spin** বা ঘূর্ণী। সকল কণিকাদেরই গতি ও আবর্তন

ছাড়া ঘূর্ণী আছে। তা আবার দু'রকমের, জোড় সংখ্যায় ও বিজোর সংখ্যায়। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের পর ডিরাক ও ফের্মি কণিকাদের জন্যে আর একটি সংখ্যায়ন প্রণয়ন করলেন—নাম হলো 'ফের্মি-ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স'। ফলে দাঁড়ালো আলোক-কোয়াণ্টা—যার কোন স্পিন নেই বা শূন্য স্পিন, ও জোড়স্পিন সমন্বিত কণিকারা বোস-সংখ্যায়ন মেনে চলে। যাদের বিজোড় স্পিন তারা মেনে চলে ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন।

প্রথমোক্তরা 'বোসন' ও শেষোক্তরা 'ফার্মিয়ন' নামে অভিহিত।

বোস সংখ্যায়নের সাথে আইনষ্টাইনের সংস্রব ঘটায় সাগর পারে বোস সংখ্যায়ন "Bose-Einstein Statistics" নামে অতঃপর খ্যাত হয়।

॥ চার

॥ ইউরোপে সত্যেন বসু ॥

[১৯২৪—২৬]

১৯১৭-এর স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা—১৯২১। দিল্লী থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান এলো ষাট লক্ষ টাকা এবং কলকাতা থেকে যুক্তবাংলার সরকারের শিক্ষামন্ত্রী প্রভাস মিত্র পাঠালেন সাড়ে চার লক্ষ টাকা।

অধ্যাপক হলেন ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত (আইন], ডাঃ রমেশ মজুমদার (ইতিহাস), ডাঃ ভূপতি সেন (অঙ্ক), ডাঃ জ্ঞান ঘোষ (রসায়ন), চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিত মজুমদার (বাংলা) আর সত্যেন বোস—পদার্থ বিজ্ঞানের রীডার।

সত্যেন বসুর বেতন : ৪০০—১২০০ টাকা। এখানে তাঁর অধ্যাপনার বিষয়—পদার্থ বিজ্ঞান কিন্তু অঙ্ক ও রসায়ন—এমন কি প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বুঝাতেন ছাত্রদের অবসর সময়ে। এই অধ্যাপনার সাথে চলল গবেষণা—যার ফল 'বোস সংখ্যায়ন'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সত্যেন বসুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচায় ইউরোপে পাঠানো স্থির করায় সত্যেন বসু বিদেশযাত্রার জন্য তৈরী হলেন। বিদেশে তিনি পাবেন মাসে আড়াই'শো টাকা এবং বাড়িতে স্ত্রী পাবেন মাসে দু'শো টাকা।

যাত্রার আগেই তিনি আইনষ্টাইনের পত্র পেলেন : বোস-সংখ্যায়নের স্বীকৃতি। খুশী মনে তিনি সাগর পারে যাত্রা করলেন।

প্রথমেই ফ্রান্স। প্যারিসে **17 Ruedu Sommerard** ঠিকানায় প্রবোধ বাগচীর বাসায় উঠলেন। বাগচী অধ্যাপক সিলভঁ্যা লেভির অধীনে গবেষক ছাত্র এবং প্যারিসের ভারতীয় ছাত্রসমিতির সম্পাদক। ছাত্রসমিতিতে জুটতেন ভারতীয় ছাত্র বিপ্লবীরা।

বাগচীর অধাপক লেভির সৌজন্যে সত্যেন বসু ম্যাডাম কুরী, অধ্যাপক লাসভা এবং ডিব্রোলী ভ্রাতৃদ্বয় মরিস ও লুঁই (পরে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী)-র সাথে পরিচিত হন।

আমরা পূর্বেই বলেছি সত্যেনের পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসুর 'ইণ্ডিয়ান কেমিক্যল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল' নামক একটি প্রতিষ্ঠান ছিল—যার কারখানা ছিল কলকাতার হালসীবাগানে। এখানে এক ফরাসী ভদ্রলোকের সাথে সত্যেনের বাল্যকালে পরিচয় ঘটে এবং তাঁরই যোগাযোগে ফরাসী ভাষা শেখার এক সমিতিতে তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন কিন্তু উচ্চারণে একটু অসুবিধা ছিল। তবুও তিনি ফরাসী বৈজ্ঞানিকদের সাথে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে মেলামেশা করতে সক্ষম হন—কেন না তাঁর ছিল অভাবনীয় প্রতিভা। ফ্রান্সে সত্যেন ছিলেন এক বছর। এর মধ্যে তিনি কুরীর কাছে এবং মরিস ডিব্রোলীর গবেষণাগারে 'রঞ্জন রশ্মি' নিয়ে কাজ করেন।

ফ্রান্সের পর জার্মানী। বার্লিনে সত্যেন বসু আইনষ্টাইনের সঙ্গে মিলিত হলেন—পরোক্ষ পরিচয় প্রত্যক্ষ পরিচয়ে হ'ল পরিণত। আইনষ্টাইন মৃত্যুকাল পর্যন্ত (এপ্রিল ১৮, ১৯৫৫) কর্মে ও চিন্তায় সত্যেনের সাথে রেখেছিলেন যোগাযোগ। অপর বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক প্ল্যাঙ্কের সাথে সত্যেনের হয় যোগাযোগ। বার্লিনে আইনষ্টাইন সত্যেনকে বিখ্যাত Colloquium এর সঙ্গে যুক্ত করেন।

*　　　*　　　*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপকের পদটি হয় খালি। সত্যেন বোসের এই পদটি পাবার প্রধান বাধা তিনি ডক্টরেট নন। কথাটা শুনে আইনষ্টাইন সত্যেন বোসের সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র পাঠালেন। পত্রের বক্তব্য ছিল ঃ বোস বিজ্ঞানে যা করেছেন তাই তাঁর সবচেয়ে বড়ো ডিগ্রি। তাঁর প্যারিসে আগমণে আমরা উপকৃত।

বলা বাহুল্য এর ফলে সত্যেন বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক হন। এই পদে তিনি অধিষ্ঠিত থাকেন ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। তারপর হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খয়রা' অধ্যাপক। সে সব কথা পরের কথা।

॥ পাঁচ ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : সত্যেন বসু—পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক
[১৯২৬—৪৫]

১৯২১—২৬ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার, অধ্যাপক (১৯২১—২৬) ; সত্যেন বসুর জীবনের এই যুগে দুটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১। বোস সংখ্যায়ন সৃষ্টি এবং বিজ্ঞানের জগৎসভায় আইনষ্টাইনের পাশাপাশি আসন গ্রহণ : ১৯২৪

২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচায় প্রথম ইউরোপ ভ্রমণ : (১৯২৪—২৬)

এই দুটি ঘটনা এই পুস্তকে বিগত পরিচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচিত হওয়ায় এর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রথম ইউরোপ ভ্রমণের পর দেশে ফিরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপকের পদে বৃত হন—১৯২৬। এই পদে এর আগে ছিলেন জেঙ্কিন্স সাহেব।

* * *

১৯২৬—৪৫ সাল। একাদিক্রমে কুড়ি বছর এই পদে বৃত ছিলেন সত্যেন বসু। তাঁর বয়সকাল ২৭ থেকে ৫১ কাটল ঢাকায়। বোস-সংখ্যায়ন সৃষ্টিতে তাঁর যে নাম সেই নাম ধীরে ধীরে তুললো তাঁকে খ্যাতির চূড়ায়।

॥ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ॥

১৯২৯। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশন। গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সত্যেন বোস। গণিত ও

পদার্থ বিজ্ঞান শাখার সভাপতিরূপে তিনি যে বক্তৃতা দিলেন তার বিষয়—আধুনিক তত্ত্বমূলক পদার্থ বিজ্ঞানের প্রবণতা (Tendencies in the Modern Theoretical Physics).

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস (Indian Science Congress Association)-এর বেশ একটা ইতিহাস আছে। এটি ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের বাৎসরিক মিলনপীঠ। স্থাপনাকাল—নভেম্বর ২০, ১৯১৩। আপিস—এসিয়াটিক সোসাইটির ১নং পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ি।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ এসিয়াটিক সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৯৩২ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এসিয়াটিক সোসাইটির সংগঠন থেকে পৃথক হয় এবং ১৯৫২ সালে ৬৪ নং দিলখুসা ষ্ট্রীট (কলকাতা—১৭)-এ দেড় বিঘা জমির উপর এর উদ্যান ও বাড়ি তৈরী হয়।

ভারতীয় যাদুঘরের শতবার্ষিকী উৎসবের সমসময়ে ১৯১৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় ১নং পার্ক ষ্ট্রীটস্থ এসিয়াটিক সোসাইটির বাড়িতে এবং এর প্রথম সভাপতি হন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সত্যেন বসু ও তাঁর প্রতিভাবান সতীর্থগণ তখন স্নাতকোত্তর ছাত্র। পরবর্তীকালে এঁরা সকলেই ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হন।

সত্যেন বসু মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৯২৯) হন শাখা সভাপতি। পনর বছর পর যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শেষ বছর তখন (১৯৪৪) সত্যেন বসুকে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে সাধারণ সভাপতি করা হয় এবং পর বৎসর (১৯৪৫) উক্ত কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে নির্বাচিত সভাপতি ভাটনগরের অনুপস্থিতিতে সত্যেন বসুই সভাপতি হন।

দিল্লী অধিবেশনে (১৯৪৪) সাধারণ সভাপতিরূপে সত্যেন বসুর ভাষণের বিষয় ছিল তাঁর গবেষণা : 'প্রাচীন নির্ধারণ নীতি ও

কোয়ানটাম তত্ত্ব' (The classical determinism and the Quantum theory.)—যা তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতির কারণ। তাঁর এই গবেষণা বসু-আইনষ্টাইন তত্ত্বের আরও আরও অগ্রগতির চিন্তা।

রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন বসু : ১৯৩৭।

সত্যেন বোস যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে এম. এস-সি ক্লাশের ছাত্র (১৯১৩-১৫) তখন তিনি তাঁর বন্ধু ধূর্জটি প্রাসাদ মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী (ছদ্মনাম—বীরবল)র সহিত পরিচিত হন এবং প্রমথ চৌধুরীর পত্রিকা 'সবুজপত্র'-এর আড্ডার সভ্য হন। 'বিচিত্রা' ও 'পরিচয়' গোষ্ঠীর ও তিনি ছিলেন একজন সভ্য। 'সবুজ-পত্রের' আসরে রবীন্দ্রনাথের সাথে সত্যেন বসুর পরিচয় হয়। সত্যেন বসু 'শান্তিনিকেতন' এ যান একবার। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সাথে হয় তাঁর হৃদ্যতা।

তখন 'শান্তিনিকেতন'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখছিলেন 'বিশ্বপরিচয়'। 'বিশ্বপরিচয়' রবীন্দ্রনাথ সত্যেন বোসকে উৎসর্গ করেন (১৯৩৭) এবং তাঁকে একখানা পত্র লেখেন। সে পত্রের কিছুটা এখানে তুলে দিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

> বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিষগুলি কেবলি ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারি অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য, কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।
>
> * * জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহজ বই পড়তে লেগে গেলুম …অনেক লেখকের অনেক বই পড়ে গেছি…তারপরে এক সময়ে সাহস করে ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব—ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।

অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে—অথচ কবিত্বের এলাকার কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে তা অনুভব করিনে।

॥ গবেষণা ও আবিষ্কার ॥

প্লাঙ্কের কোয়ানটাম তত্ত্বকে দোষহীনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তৈরী 'বোস-আইনষ্টাইন স্ট্যাটিসটিকস্'-এর আগে ১৯১৮ সালে মেঘনাদ সাহার সাথে সত্যেন বসু বার করেন—**A new equation of state in stresses in Medium** (লণ্ডনের **Philosophical Magazine**-এ প্রকাশিত এবং ১৯২০ সালে সত্যেন বসু একক চেষ্টায় বার করেন **Energy spectrum of an atomic model** (**Philosophical Magazine**-এ প্রকাশিত)

বোস সংখ্যায়ন (১৯২৪)—এর পর সত্যেন বসুর গবেষণা ও আবিষ্কার—**Tendencies in the Modern Theoretical Physies**—যা ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশন (১৯২৯) -এ সত্যেন বসুর শাখা সভাপতিরূপে প্রদত্ত ভাষণের ছিল বিষয়বস্তু।

এর পর সত্যেন বসুর গবেষণা ও আবিষ্কার—**The classical determination and the Quantum Theory** যা ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশন (১৯৪৪)-এ সাধারণ সভাপতির ভাষণের ছিল বিষয়বস্তু।

এই তত্ত্ব বোস-আইনষ্টাইন তত্ত্বের আরও…আরও অগ্রগতির চিন্তা।

॥ অন্যান্য গবেষণা ॥

১৯৩৬। প্রশান্ত মহলানবীশের "ডি-স্কোয়ার" সংখ্যায়নের উপর গরেষণা ও সিদ্ধান্ত।

১৯৩৯। লোরেঞ্জ গ্রুপের উপর গবেষণা ও সিদ্ধান্ত।

১৯৪৫। হাইড্রোজেন পরমাণু বিষয়ক সমস্যাবলী নিয়ে গবেষণা ও সিদ্ধান্ত।

এর পরই সত্যেন বসুর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালায়র বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে খয়রা অধ্যাপকরূপে যোগদান। পরের পরিচ্ছেদে পাবেন তার বিবরণ।

॥ ছয় ॥

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ) : খয়রা অধ্যাপক

[১৯৪৫—৫৬]

[পূর্বে রিসার্চস্কলার (১৯১৬)—গণিত ও পদার্থবিদ্যার লেকচারার (১৯১৭-২১)।]

॥ অধ্যাপনা। বিদেশে আমন্ত্রণ। বিদেশ ভ্রমণ ॥

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যেন বসু খয়রা অধ্যাপক হয়ে কাজ করেন মোট বার বছর। তন্মধ্যে শেষ ছয় বৎসর তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন।

১৯৪৮-৫০। ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স (৬৪ দিলখুসা স্ট্রীট : কলকাতা-১৭)-এর সভাপতি।

১৯৫১। Unesco-এর আমন্ত্রণে সত্যেন বোস প্যারিসে যান। প্যারিস থেকে যান ইংলণ্ডে ও জার্মানীতে। জার্মানীতে আইনষ্টাইন প্রমুখ গুণী বিজ্ঞানীদের সাথে আবার মিলিত হন। এই তাঁর **দ্বিতীয়বার ইউরোপ** ভ্রমণ।

১৯৫২। সত্যেন বসু ভারতীয় রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত হন। দিল্লীতে Western Court-এ ছিল তাঁর ফ্লাট।

১৯৫৩। ফ্রান্সের Council of National Scientific Research (C N R S)-এর আমন্ত্রণে সত্যেন বসুর **তৃতীয়বার ইউরোপ যাত্রা** ঘটে। এই বছর তিনি Unitary Theory আবিষ্কার করেন। এ সম্বন্ধে তিনি আইনষ্টাইনের সঙ্গে পত্রালাপ করেন। তাঁর Unitary Theory-টি Comptes Rendus পত্রিকায় প্রকাশিত। Unitary Theory আপেক্ষিকবাদের অগ্রগতির নূতনতর তত্ত্ব।

…এর পর বুদাপেষ্টে বসল, জেনেভার World congress for General Disarmament and Peace-এর অধিবেশন। সত্যেন বসু এতে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন। **এই তাঁর চতুর্থবার ইউরোপ ভ্রমণ**। এবার তিনি রাশিয়ায়ও যান।

১৯৫৪। প্যারিসে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-সভায় যোগদান। **একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব** (Unitary Theory)-এর পর তাঁর পরবর্তী আবিষ্কার—কেলাস (Crystallography)। এ সম্বন্ধে এখানে তিনি তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এবারকার **ইউরোপ ভ্রমণ পঞ্চম**।

ভারত সরকার সত্যেন বসুকে সম্মানজনক উপাধি দিলেন—**'পদ্মবিভুষণ'**

১৯৫৫। C. N. R. S.-এর আমন্ত্রণে সত্যেন বসুর পুনরায় ফ্রান্সে গমন। এবারকার **ইউরোপ ভ্রমণ ষষ্ঠ**।

সুইজারল্যাণ্ডের বার্ণ শহরে আইনষ্টাইনের Theory of Relativity বা আপেক্ষিকবাদের পঞ্চাশ বৎসর পুর্তি সম্মেলন (50 years of Relativity Conference)-এ যোগদান করলেন সত্যেন বসু। এই বার্ণ শহরে প্রথম জীবনে আইনষ্টাইন পেটেণ্ট আফিসে কেরাণী ছিলেন।

বার্ণ শহর আইনষ্টাইনের বাল্য-স্মৃতিমণ্ডিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর নাৎসি-নেতা হিটলারের য়িহুদী-নিধনযজ্ঞের জন্য য়িহুদী সন্তান আইনষ্টাইন দেশত্যাগী হন এবং মার্কিন দেশে আশ্রয় পান।

সেখানকার এক হাসপাতালে আইনষ্টাইন (১৯৫৫) প্রাণত্যাগ করেন—এপ্রিল ১৮। তখন আইনষ্টাইনের বয়স হয় ৭৫।

গুরু আইনষ্টাইনের মতো সত্যেন বোস ছিলেন ফ্যাসিবাদ বিরোধী। 'আইনষ্টাইন' সম্বন্ধে বাংলার একটি প্রবন্ধে স্বল্প কথায় তিনি নব্য-বিজ্ঞানে আইনষ্টাইনের অবদানের মূল্যায়ন করেছেন। প্রবন্ধটি 'পরিচয়' পত্রিকায় বাংলা ১৩৪২ সনের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধটির অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরছি :—

***মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব অনুমোদিত গণিতশাস্ত্রের ভিত্তি ব্যক্তিনিরপেক্ষ দেশকালের পরিকল্পনার উপর নির্ভর করিতেছে। এই পরিকল্পনার পরিবর্তে আপেক্ষিকবাদের প্রচার করিতে গিয়া আইনষ্টাইন দেখিলেন, নিউটনীয় শক্তি পরিকল্পনার স্থান তাঁহার প্রবর্তিত নূতন বিজ্ঞানে নাই। কাজেই জড়ের, গ্রহের তারকারাজির গতি-বৈচিত্র্যের ভিন্ন হেতু নির্দেশের প্রয়োজন হইল।

*   *   *

১৯৫৬। এবার লণ্ডনে **British Association for the Advancement of Science**-এর আমন্ত্রণে এলেন সত্যেন বসু। এবারকার **ইউরোপ ভ্রমণ সপ্তম**। এদিন ইংরেজরা সত্যেন বসুকে স্বীকৃতি দেননি। ইংরেজের টনক নড়ল। তাঁরা সত্যেন বসুকে রয়াল সোসাইটির ফেলো করে (১৯৫৮) তাঁকে দেন স্বীকৃতি।

১৯৫৬। সত্যেন বসুর বয়স এখন ৬২। অধ্যাপনার কাজ থেকে তিনি অবসর পান। প্রাশ চল্লিশ বৎসর ব্যাপী শিক্ষকতার জীবন (১৯১৭-৫৬)হ'ল শেষ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ থেকে বিদায় পেলেও সত্যেন বসু হ'লেন ঐ বিজ্ঞান কলেজের স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি আর হলেন রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বভারতী'র উপাচার্য রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে "শান্তিনিকেতন" এ চললেন সত্যেন বসু।

॥ সাত ॥

সত্যেন বসু। বিশ্বভারতীর উপাচার্য ঃ

[১৯৫৬ | ১লা জুলাই—১৯৫৮]

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে সত্যেন বসু রাখলেন তাঁর নিপুণ পরিচালনার ছাপ।

শান্তিনিকেতন। বিশ্বভারতীর পাঠ্য ও পঠনে তিনি নূতন কার্যক্রম প্রবর্তন করলেন। এর ফলে বিশ্বভারতীতে সাধারণ বিজ্ঞানের ক্লাস খোলা হ'ল—১৯৫৮।

শ্রীনিকেতন শ্রীনিকেতনে হয় হাতেকলমে কারুশিল্প শিক্ষা। ব্যয়সাধ্য বলে ছুতোরের কাজটা উঠে যাচ্ছিল। সত্যেন বসু তা রোধ করলেন এবং নূতনতর কর্মের পথ করলেন উন্মুক্ত। সরকারী সাহায্য নিয়ে তিনি খাদি, গ্রামোন্নয়ন ও জনশিক্ষার জন্য খুললেন শিক্ষক বিদ্যালয়। এর অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করলেন অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন।

শান্তিনিকেতনে বিজ্ঞানশিক্ষা ও শ্রীনিকেতনে কারুশিল্পের শিক্ষণে পূর্ণরূপ সম্পন্ন করবার আগেই সত্যেন বসুকে বিশ্বভারতীর উপাচার্যের পদ ত্যাগ করতে হ'ল। উচ্চতর গবেষণায় সত্যেন বসুকে নিযুক্ত

রাখবার জন্য ভারত সরকার তাঁকে 'জাতীয় অধ্যাপক' পদে বরণ করলেন (১৯৫৮) এবং কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ তাঁকে 'এমেরিটাস প্রফেসর' পদ দিলেন (১৯৫৮)। এই দুই পদমর্যাদায় তিনি ভূষিত ছিলেন আমরণ।

১৯৫৭ সালে ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপুর্তি উৎসব। এই অনুষ্ঠানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সত্যেন বসুকে দিলেন 'ডক্টরেট' উপাধি। এই বৎসরেই 'যাদবপুর' ও 'এলাহাবাদ' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেলেন 'ডক্টরেট' উপাধি। পর বৎসর (১৯৫৮) তিনি লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত হন। তখন তিনি প্যারিস হয়ে লণ্ডনে যান। এবার তাঁর **অষ্টম ইউরোপ** যাত্রা।

সামনে তাঁর জীবনের আর মাত্র ষোলটি বৎসর অবশিষ্ট। সে কাহিনী সৃষ্টিধর্মী জীবনকাব্য। সেই কাব্য একজন বিজ্ঞানী মানুষের কাব্য। সত্যেন বসুর কথায় বলি—নিয়ন্তার খবর আমি রাখি না—তবে এটুকু দেখতে পাই স্পষ্ট যে, কোন শক্তি প্রতি মানুষের মধ্যে দিয়েই গড়ে তুলতে চাইছে এক একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপের ছাঁচ।

কথাটা কি খুব সত্যি নয়! আপনারা উপলব্ধি করে দেখবেন তো!

॥ আট ॥

॥ জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ॥

[১৯৫৮—১৯৭৪]

সত্যেন বসু সম্বন্ধে একদা শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন :

> সত্যেন হয়ে উঠেছিল একটি বিচিত্র আবির্ভাব—কীর্তিমান বৈজ্ঞানিক হয়েও শিল্পজ্ঞ, বহুজ্ঞ, বিশ্বের মানচিত্রের সুদূরতম প্রদেশেরও সাংবাদিক। তাই উচ্চাশী বেকনের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে পারতো বৈ কি : I have taken all

knowledge to be my province—যা কিছু জ্ঞাতব্য আছে জানতে না পারলে আমি স্বস্তি পাই না।

বিগত দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ব্যাপী সত্যেন বসুর নিরলস বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে আমরা শ্রীঅরবিন্দ কথিত এই পুরুষটির আসল রূপ দেখতে পাই। ১৯৫৮ সালে যখন তিনি জাতীয় অধ্যাপক হলেন তখন সত্যেন বসুর বয়স ৬৪ বৎসর। যৌবন অতিক্রান্ত···প্রৌঢ় জীবনের সুরু। তখনও তাঁর বিজ্ঞান-চর্চা ও বিজ্ঞান-প্রসারের কাজও গবেষণা চলছে অব্যাহত।

তাঁর বিজ্ঞান-চর্চার বৈশিষ্ট্য—দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা। তাঁর বিশ্বাস ছিল আপামর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার দেশ ও জাতির মঙ্গল সাধনের একমাত্র উপায়। আর শিক্ষা প্রচার হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে। এর জন্যই তিন স্থাপনা করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ—যা তাঁয় প্রৌঢ় জীবনে ছিল প্রাণ স্বরূপ।

পৃথিবীর বিজ্ঞানের শিরোনামায় এখন সত্যেন বসু। তাঁর গবেষণা ছিল মৌল ও পরীক্ষামূলক। তত্ত্ব ও যন্ত্র আবিষ্কারে তাঁর ছিল সমান কীর্তি। বোস-সংখ্যায়ন (১৯২৪) তাঁকে এনে দিল বিশ্বজোড়া খ্যাতি। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য আবিষ্কৃত তত্ত্ব: প্রাচীন নির্ধারণবাদ ও কোয়ানটাম তত্ত্ব—বিশ্ববিজ্ঞানের আরো আরো অগ্রগতির চিন্তা। প্রশান্ত মহলানবীশের ডি-স্কোয়ার সংখ্যায়ন, লোরেঞ্জ গ্রুপ, বিকিরণ, কেলাস, একীকৃত ক্ষেত্র, ভেষজ, আপেক্ষিকতা, সমীকরণ, তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্র, হাইড্রোজের পরমাণু, রমন পরমাণু, ডাই ইলেকট্রিক কনস্টানট, আরটিফিশিয়াল আইওলোস্কিমা, ক্লিনগরডন নিয়ে তাঁর সফল গবেষণা এবং চৌম্বক ফিতা ও এক্সরে ক্যামেরা নির্মাণ তাঁর বৈজ্ঞানিক কীর্তি। এতে তাঁর অলৌকিক প্রতিভা, অসামান্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও কর্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

জীবনব্যাপী সাধনা তাঁর একটুও উপেক্ষিত নয়—পরন্তু সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত কিন্তু তিনি ছিলেন নিরহঙ্কার এবং উদাসীন—শিশুর মত সদাহাস্যময়। যতই তাঁর বয়স বেড়েছে ততই এদেশের লোক ও বিদেশের লোকরা জানলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার সার্থকতা—আর দেশবিদেশে তিনি পেলেন সম্মানের ডালি। আজ তিনি আমাদের মধ্যে না থাকলেও এ পৃথিবী তাঁকে ভুলতে পারিবে না যতদিন কণা-বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের বর্তমান কাঠামো থাকবে। কারণ তাঁরই তৈরী সংখ্যায়নের উপর এই কাঠামোর অবস্থিতি।

প্রৌঢ়জীবন (১৯৫৮-৭৪)-এ তাঁর কীর্তি ও সম্মানের বিবরণ আমরা এখানে দিলাম।

১৯৬১। বয়স ৬৭। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম' উপাধি লাভ।

১৯৬১। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উৎসবে সত্যেন বসুর সভাপতিত্ব।

প্রধান অতিথি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য সুরজিত লাহিড়ী। সত্যেন বসুর প্রদত্ত অভিভাষণের সারাংশ 'বৈজ্ঞানিকের সাফাই' নামে প্রকাশিত। আমরা তা থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি—

* * * * আমাদের দার্শনিক উপাচার্য একটা খুব জটিল প্রশ্ন (=বিজ্ঞান হয়তো শেষ অবধি আমাদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে) করেছেন। × × দার্শনিক মতবাদ এত রকম উঠেছে তার মধ্যে আমরা কোন আশ্বাসবাণী খুঁজে পাই না। আমাদের দার্শনিক অতিথির দার্শনিক মতবাদ কি তাও আমরা জানি না। (কি সাহসী স্পষ্টবক্তা)।

* * * সৃষ্টির রহস্য বুঝতে মানুষ সব সময় চেষ্টা করছে, বিজ্ঞানীরাও করে থাকেন। কিন্তু তার সামান্য আধারে কি

পূর্ণ শক্তিকে সত্য করে ধরা যাবে। এটা বিজ্ঞানীর ভাব-ধারণার অতীত, তার দার্শনিকেরা হয়তো তাও সম্ভব মনে করতে পারেন। কিন্তু সে অবস্থায় পৌঁছলে তাঁকে মনে করতে হবে এই শারীরিক আধারও একটা মায়া এবং বস্তুতঃ তিনি নিজেও সেই মহাশক্তির সঙ্গে অভিন্ন।

অবশ্য আমাদের দেশের এইভাবে অনেক মত প্রচার হয়েছে—হয়তো বা এখনও পর্যন্ত অনেক লোক এটা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করেন। সেই বোধ হলেই কথাচ্ছলে আমরা বলি 'তার একদম মুক্তি হয়ে গেলো'। বিজ্ঞানী ভাবে, তিনি কোথায় গেলেন ? তার সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর কোন সম্পর্কই রইল না। ইত্যাদি

১৯৬২। বয়স ৬৮।

(ক) প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা: ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউট—সংক্ষেপে আই. এস. আই (আম্রপালি, বরানগর)-এর কাছে সত্যেন বসুর 'ডক্টর' উপাধি লাভ। 'ডানলপ' ব্রীজের কাছাকাছি বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত 'আম্রপালি'তে আই. এস. আই-র বিরাট বাড়ি। এর প্রতিষ্ঠাতা 'বিধান সরণী'র প্রবোধ মহলানবীশের জ্যেষ্ঠ পুত্র সংখ্যাবিদ্ প্রশান্ত মহলানবীশ (মৃত্যু—১৯৭২)।

প্রশান্ত মহলনাবীশ ডঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জামাতা—অতএব কবি ডি. এল. রায়ের ভাইরা-ভাই। এঁরা ব্রাহ্ম।

ইউনাইটেড লেবার স্ট্যাটিস্টিক্যাল কমিশনের আমন্ত্রণে ও পপুলেশন কন্‌ফারেন্সে যোগদানের জন্য স্ত্রী নির্মলা (রাণী) সহ প্রশান্ত নিউ ইয়র্কে গেলে (১৯৪৬) সত্যেন বসু (তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক) আই. এস. আই-এর তত্ত্বাবধানের ভার নিয়ে আম্রপালিতে বাস করেন।

পরবর্তীকালে সত্যেন বসু আই. এস. আই-এর সভাপতি হন। মৃত্যুকালেও তিনি ছিলেন এর সভাপতি।

(খ) ১৯৬২। মার্চ ২৪ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ।

এ বছর আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে সত্যেন বসুর ইংরাজী ভাষণ দান (মার্চ ২৪ শনিবার, ১৯৬২)। তাঁর বক্তব্য ছিল ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের কুফল ও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা। আমরা এখানে তার অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

* * * Our foreign masters had wanted intelligent Indians to help them run their administration and their offices economically ; and so for many guardians living in the cities, it seemed that the broad way to soft jobs, and easy comfortable lives of their words run through the portals of the University. × × × Many years before, the Catholic missionaries of Serampore had thought of a better alternative. They were first to erect a Bengali Printing Press. × × ×. They also published text books of Science and Mathematics in Bengali for the beginners. × × × The task of spreading knowledge was soon taken up by the Indian Educationists (Iswar Chandra and Akshay Chandra). × × × In creative literature, after vain efforts to write to a foreign tongue, Madhusudan and Bankim

Chandra realised that to gain approval of the people and an easy access to their hearts one has to write in one's own hearts' blood. × × × if this University had then proclaimed the principle of dispending learning through the medium of the mother tongue, perhaps our dream about the advent of a new era in this ancient land would have come true much earlier.

বাংলা অর্থ :

আমাদের বিদেশী প্রভুরা বুদ্ধিমান ভারতবাসীদের দিয়ে তাঁদের অফিসগুলো সস্তায় চালাতে চেয়েছিলেন। ফলে শহরের অভিভাবকরা দেখলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর দরজা তাঁদের পুত্রদের পক্ষে সহজে চাকুরি লাভ এবং আরামে জীবনযাপনের প্রশস্ত পথ। × × × অনেক বছর আগে শ্রীরামপুরের ক্যাথলিক মিশনারীরা এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁরাই এদেশে বাংলা ছাপাখানার পত্তন করেন। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তাঁরা বিজ্ঞান ও অঙ্কের বাংলা পাঠ্যপুস্তক ছাপালেন। × × × শিক্ষাপ্রচারের ভার শীঘ্রই নিলেন এদেশের শিক্ষকরা [ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র।] * * * সৃজনমূলক সাহিত্যে বিদেশী ভাষায় ব্যর্থ সাহিত্য রচনার পর মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন সাধারণ মানুষের স্বীকৃতি পেতে হ'লে এবং ওদের অন্তরে স্থান পেতে হ'লে হৃদয়ের রক্ত দিয়ে লিখতে হয়। × × × × মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞানপ্রচারের ভার প্রথম থেকে যদি এই বিশ্ববিদ্যালয় নিতেন তা হ'লে এই প্রাচীন দেশে নবযুগের আবির্ভাবের স্বপ্ন আমাদের এদ্দিন সফল হত।

সুন্দর ইংরেজী, মনোহর প্রকাশভঙ্গী—হৃদয়গ্রাহী চিন্তা!

গ) শান্তি সম্মেলন—এস্‌কিলষ্টুনা, সুইডেন

[মেঃ ১৯৩০, ১৯৬২]

সত্যেন বসু ছিলেন ফ্যাসিবাদ বিরোধী বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক। আমন্ত্রিত হয়ে তাই তিনি সুইডেনের উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। **এই তাঁর নবম ইউরোপ ভ্রমণ।**

ঘ) টোকিও-তে বিজ্ঞান সম্মেলন

[আগষ্ট : ৬-৮, ১৯৬২]

আলোচ্য বিষয় : বিজ্ঞানচর্চায় দেশের মঙ্গল ও মানুষের ভবিষ্যৎ : এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে সত্যেন বসু জাপানে যান। জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি পরবর্তী 'ইংরেজী হঠাও' সম্মেলন (হায়দরাবাদ) ও 'রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন' (মার্চ ২২, ১৯৬৩) ভাষণে বিবৃত করেন।

ঙ) 'ইংরেজী হঠাও' সম্মেলন (হায়দরাবাদ)

সত্যেন বসু বাংলায় দেন উদ্বোধন ভাষণ। জাপান ভ্রমণ সম্বন্ধে তিনি বলেন :

> * * *প্রায় একশো বছর হ'ল পাশ্চাত্যজার্তের হাতে ঘা খেয়ে জাপান ঠিক করলো, যে জ্ঞান ও বিদ্যার জন্য প্রতীচ্য এত শক্তিমান হয়েছে তাদের দেশের সে-জ্ঞান ও সে-বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে। এখনও একশো বছর হয়নি। এরই মধ্যে জাপানের কীর্তিকলাপের কথা সকলেই জানেন।
>
> * * * স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে, এত অল্প সময়ের মধ্যে দেশের সেই দুরবস্থা থেকে বর্তমানে এই অতি সম্পদের মধ্যে কি করে তারা দেশবাসীদের আবার তুলে ধরল। আমি তাই জানতে চেষ্টা করেছিলাম, সেখানে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা কি রকম ভাবে হয়েছে। আমাদের ভারতীয় ভাষাগুলির তুলনায় জাপানী ভাষার কতকগুলি অসুবিধা আছে; যাঁরা একটু খবর রাখেন, তাঁরাই জানেন × × × এত অসুবিধা সত্ত্বেও

এমন অবস্থা জাপানী ভাষার যে, প্রত্যেক জাপানী বিজ্ঞানী জাপানী দার্শনিক নিজের মনের প্রত্যেকটি কথা জাপানীতে প্রকাশ করতে পারেন।

১৯৬৩। বয়স ৬৯।

(ক) রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসব

[মার্চ ২২, ১৯৬৩]

সত্যেন বসু তাঁর ভাষণে জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। এই বর্ণনায় বলা হ'ল জাপানীরা প্রায় সকলেই শিক্ষিত। তাঁরা জাপানী ভাষায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব নিজেদের মাতৃভাষা জাপানী ভাষায় শিখেন।

(খ) ইজিপ্টে বৈজ্ঞানিক সফর

[জুলাই—১৯৬৩]

১৯৬৪। বয়স ৭০।

সত্যেন বসুর সপ্ততিতম জন্মদিনে মহাজাতি সদনে সম্বর্ধনা :

[জানুয়ারী ১, ১৯৬৪]

পশ্চিমবাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের সভাপতিত্বে মহাজাতি সদনে দেশবাসীর পক্ষে 'অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু সপ্ততিতম জন্মদিন উৎসব সমিতি' সত্যেন বসু-কে তাঁর সপ্ততিতম জন্মদিনে জানালেন সম্বর্ধনা। এই উপলক্ষে একখানি সুভেনির (দাম—আট আনা) ও তিনখণ্ডে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

প্রথম খণ্ড : বোস সংখ্যায়ন : দাম—দশ টাকা,

দ্বিতীয় খণ্ড : পৃথিবীর খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের গবেষণাপত্র : দাম—পচিশ টাকা,

তৃতীয় খণ্ড : সত্যেন বসুর সপ্ততিতম জন্মদিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা চক্রের গবেষণা পত্রসমূহ : দাম—ছ'টাকা।

প্রাপ্তিস্থান : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ : পি-২৩ রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট। কলকাতা-৬।

১৯৬৫। বয়স ৭১।

সত্যেন বসুর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী পদক' লাভ—১৯৬৫ :

সত্যেন বসুর 'বিজ্ঞানের সঙ্কট ও অন্যান্য প্রবন্ধ' নামক বাংলা পুস্তক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করলো। তাঁর এই সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতির জন্য তিনি কলকাতা বিশবিদ্যালয়ের কাছ থেকে পেলেন 'জগত্তারিণী পদক'।

১৯৭৩। বয়স ৭৯।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে সত্যেন বসুর বাংলায় ভাষণ :

ছত্রিশ বৎসর আগে ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বাংলায় ভাষণ দেন। তারপর এইবার বাংলায় ভাষণ দিলেন সত্যেন বসু।

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিউটের সমাবর্তন উৎসব
[ডিসেম্বর ৩১, ১৯৭৩]

সত্যেন বসু এই ইনষ্টিউটের ছিলেন সভাপতি। সমাবর্তন উৎসবে তিনিই হন সভাপতি।

কলকাতা গণিত সমিতি আয়োজিত

সত্যেন বসুর আগামী অশীতিতম জন্মদিন উপলক্ষে

সম্বর্ধনা ও সেমিনার

তারিখ ২৯।৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭৩

এশিয়াটিক সোসাইটি :

এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানীয় সদস্যপদ লাভ করেন সত্যেন বসু।

পরদিন প্রভাত হবে যখন তখন ১৯৭৩ হবে শেষ এবং সুরু হবে নূতন বছর ১৯৭৪। ১৯৭৪ যেন নূতন বছর নয়—যেন কাল বছর। এই বছরের প্রারম্ভে আমরা হারালাম বিশ্ববিজ্ঞানী সাহিত্যিক এবং মাধুর্যভরা মানুষ—সত্যেন বসু—ফেব্রুয়ারী ৪, ১৯৭৪। তাঁর পিছু নিলেন সঙ্গীতশিল্পী অনাদি ঘোষ দস্তিদার, রেডিও শিল্পী সুধীর সরকার, নটশিল্পী পাহাড়ী সান্যাল, চিত্র সঙ্গীতশিল্পী অর্ধেন্দু কুমার গাঙ্গুলী, সাহিত্যিক মুজতবালি, কবি বুদ্ধদেব বসু, সাহিত্যকর্মী পবিত্র গাঙ্গুলী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী নিখিল গুহরায়।

এই কাল বছরের প্রথম দিনে সত্যেন বসুর জন্মদিন এবং পর মাসের চতুর্থ দিনে তাঁর মৃত্যুদিন। জন্মদিনের পাশে এসে দাঁড়ালো মৃত্যুদিন। যেন জন্মের হাত ধরে দাঁড়ালো মৃত্যু। মৃত্যু—যা অনিবার্য!

জন্মদিন। মৃত্যুদিন
[১৯৭৪]

পরদিন প্রভাত। ১৯৭৪ সনের ১লা জানুয়ারী। সত্যেন বসুর অশীতিতম জন্মদিন। সূর্যোদয়ের আগেই তাঁর ২২নং ঈশ্বর মিল লেনের বাড়িতে হলেন উপনীত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের বিশুদ্ধ রসায়ন বিভাগের অধ্যাপিকা ডাঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায় আগামী 'ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস'-এর মনোনীত সভাপতি। তিনি লিখেছেন—

> শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাবার জন্য শত সহস্র দেশবাসী—আবাল বৃদ্ধ বনিতা সূর্যোদয়ের আগেই তাঁর বাসস্থানে উপস্থিত হয়েছিল। অশীতিবর্ষের বিশ্ববিখ্যাত মানবদরদী জাতীয় অধ্যাপককে তারা অসংখ্য ফুলের মালা আর ফুলের তোড়া দিয়ে পরম শ্রদ্ধা জানিয়ে গেল। গায়ে সাদা শাল, পরনে সাদা পায়জামা। তিনি ছিলেন খাটের উপরে বসে আর সকলকে জানাচ্ছিলেন সম্ভাষণ। মুখে তাঁর সরল হাসি। সমবয়স্কদের জানাচ্ছিলেন প্রীতি ও শুভেচ্ছা, ছাত্র-ছাত্রী কিশোর-কিশোরী-দের করছিলেন আদর আর বুকভরা আশীর্বাদ, যেমন তপোবনের মহর্ষি।

সত্যেন বসু ছিলেন যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক তখন অসীমা ছিলেন ঢাকা কলেজের ছাত্রী। রসায়ন-শাস্ত্রে এম. এস-সি পাশ করে তিনি গবেষণায় রত হন এবং ডি. এস-সি হন। মার্কিন মুলুকে তিনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের জন্য যান (১৯৪৭)। ১৯৬৭ সালে অসীমা হয়েছেন পিতৃহারা ও স্বামীহারা।

প্রশান্ত মহলানবীশের স্ত্রী নির্মলা (রাণী) ঐ কাগজের ঐ সংখ্যায় লিখেছেন—

> সত্যেন্দ্রনাথের জন্মদিন—১লা জানুয়ারী। ১৯৭৪ সালে আশী বছর পূর্ণ হলো। গেলাম সকাল বেলা ঈশ্বর মিল লেনে। গিয়ে দেখি ঘরভরা লোক, অনেক বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত, অনুগত। সকলেরই সেদিন আনন্দ করবার দিন। কেউ ফুল, কেউ মিষ্টি, কেউবা আবার নিজের রচিত 'ছড়াকাটা' বই উপহার এনেছে। সত্যেন বাবু খাটের উপর বসে স্মিতমুখে সবাইকে 'এসো, এসো,' বলে অভ্যর্থনা করছেন। আনন্দে হাসিতে উজ্জ্বল মুখ। বড় মেয়ে নীলিমাকে ডেকে বলছেন 'ওরে, এদের সন্দেশ দে' ইত্যাদি। নিজে তো অসুখের (ডাইয়েবেটিস) জন্যে মিষ্টি খেতে পারতেন না, কিন্তু অন্য সকলকেই খাওয়াবার জন্যে ব্যস্ত। অত্যন্ত ভালবাসতেন লোকজন খাওয়াতে। সেদিন বাড়ীর কর্ত্রীর কি আনন্দময়ী মূর্তি। চওড়া লালপাড় শাড়ী পরা, মাথায় এতখানি মোটা করে সিঁদুর—একগাল হাসি নিয়ে ঘরে এসে দাঁড়াতেই 'দাও, দাও, এদের সবাইকে সন্দেশ খাওয়াও।'

১৯৭৪। ১লা জানুয়ারী—আজ শুধু সত্যেন বসুর অশীতিতম জন্মদিন উৎসব নয়, বোস সংখ্যায়নের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উৎসব ও আজ থেকে সুরু। উৎসব—তাই আজ মহোৎসব। সত্যেন বসুর সম্বর্ধনা তাই আজ ঘরে, বাইরে! বাইরে :

(ক) সত্যেন বোস জন্মোৎসব কমিটি ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের যৌথ উদ্যোগে

সত্যেন বসুকে সম্বর্ধনা :

স্থান—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবন

তারিখ : জানুয়ারী ২, ১৯৭৪

সত্যেন বসুকে উপহার দেওয়া হয় আশীটি গোলাপ ফুলের একটি গুচ্ছ। আর সিল্কের চাদর ও পরিষদের প্রকাশিত বই-এর একটি সেট। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ আবদুল মতিন চৌধুরী—সত্যেন বসুর প্রাক্তন ছাত্র। তিনি বললেন—অধ্যাপক বোসের সংখ্যায়নের জন্য ঢাকা পৃথিবী খ্যাত।

সত্যেন বসু তরুণদের বললেন—মাতৃভাষায় বিজ্ঞান লিখতে অভ্যস্ত হও!

খ) সত্যেন বসুর অশীতিতম জন্ম দিবস

ও

বোস সংখ্যায়নের পঞ্চাশ বৎসর পুর্তি

উপলক্ষে

সার্বজাতিক সম্মেলন

স্থান : বোস ইনষ্টিটিউট

এবং

আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র

স্থান : বোস ইনষ্টিটিউট ও কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ

তারিখ : ৮—১১ জানুয়ারী। ১৯৭৪

সম্বর্ধনার উত্তরে সত্যেন বসু বললেন—পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে খুব সমাদর পাচ্ছি। সবই তো পেলাম। আর বেঁচে কি করবে!

গ) ঐ উপলক্ষে

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউট

(আই. এস. আই)-এর

সম্বর্ধনা :

ডাঃ সি. আর. রাও আই. এস. আই-এর পক্ষ থেকে সত্যেন বসুকে দিলেন একখানা রূপার থালা আর আম্রপালিতে তোলা ছবির অ্যালবাম।

ঘ) সত্যেন বসুর অশীতিতম জন্মদিন
ও
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের রজত-জয়ন্তী
উপলক্ষে বিজ্ঞান প্রদর্শনী

স্থান : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ

তারিখ : জানুয়ারী ২৪। ১৯৭৪

জানুয়ারী ২৪। ১৯৭৪। প্রায় একমাস ধরে সভা সমিতিতে ছুটা ছুটি করায় সত্যেন বসু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জানুয়ারী ২৬ থেকে সুরু হয় তাঁর নিঃশ্বাসের কষ্ট। ঘনিয়ে আসে মৃত্যুদিন—সকাল ছটা। ফেব্রুয়ারী ৪। ১৯৭৪।

২৬শে জানুয়ারী খবর পেয়ে দেখতে এলেন প্রশান্ত মহলানবীশের স্ত্রী নির্মলা (রাণী)। তিনি বললেন, "আমি এই ভয়ই করছিলাম, প্রতিদিন যখন খবরের কাগজে দেখছি যে, ন্যাশানাল প্রোফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বসু অমুক জায়গায় ভাষণ দিচ্ছেন, অমুক জায়গায় অর্ঘ্য নিচ্ছেন, কখনও বা কোথায় নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছেন, দেখে দেখে আতঙ্ক হয়েছে। ...কেন আপনি এ রকম করলেন ?

হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে সত্যেন বসু বলেন—তুই জানিস্ না, আমাকে যে কেউ ছাড়ে না তাই।

বড় মেয়ে নীলিমা বললেন—ছাড়ে না, বাবা এসব ভালবাসেন। মানুষজনের সঙ্গে দেখা হয়, কত বিদেশীদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, আরো কত কি !

নিঃশ্বাসের কষ্ট ; তার উপর বমি। ডাক্তারের বারণ, রোগীর ঘরে বাইরের কেউ যাবে না। অভ্যাগতরা বাইরে থেকে খবর নিয়ে চলে যান।

২রা ফেব্রুয়ারী শনিবার। সত্যেন বসু আজ একটু সুস্থ। উঠে বসে অঙ্ক কষতে বসেন। এই তাঁর শেষ অঙ্ক! এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান

কলেজ (কলকাতা)-এর ফলিত গণিত বিভাগের অধ্যাপক পরিমল কান্তি ঘোষের বিবরণ :

> আচার্য বোস জীবন-সায়াহ্নে যে ফের্মা (Fermat) সংখ্যাগুলি কৃত্রিম অর্থাৎ মৌলিক নয়, সেগুলির গুণনীয়ক নির্ণয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। অপরের কষা অঙ্ক তাঁর ভাল লাগতো না—সেটা আবার নিজের মত করে নিজে না করলে তাঁর পরিতৃপ্তি হতো না। তাই তিনি এই বিষয়টির আদি থেকে পুনরাশীলন করছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪, সোমবার প্রত্যুষে—তার আগের শনিবার (২রা ফেব্রুয়ারী) তিনি একটু সুস্থ বোধ করছিলেন বেশ কয়েক দিনের কষ্টের পর এবং সেদিন খাতা-কলম নিয়ে এই সমস্যায় আবার হাত দিয়েছিলেন। দুর্বলতার জন্যে তাঁর হাত চলছিল না—একটি দৌহিত্রকে দিয়ে নিজের কব্জিটি ধরিয়ে যা লিখেছিলেন, তার ফটো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

৩রা ফেব্রুয়ারী রবিবার রাত্রে সত্যেন বসুর স্বাস্থ্যের অবনতি হয় এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সকাল ছ'টায় জীবনাবসান। আধুনিক পৃথিবীর পদার্থ বিজ্ঞানের এই পথিকৃৎ জন্ম নিয়েছিলেন আমাদের এই বাংলায়। বাংলা তথা এই পৃথিবী তাঁকে হারালো চিরদিনের জন্য।

॥ দশ ॥

॥ মহাপ্রয়াণ ॥

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—সকাল ছ'টা ; বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক সত্যেন বসু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সকালের রেডিও-তে ঘোষিত হল এই দুঃসংবাদ।

গাড়ি আর মানুষে ঈশ্বর মিল লেন ছাপিয়ে ভরে গেল বিধান সরণী। এলেন রাজ্যপাল, এলেন মুখ্যমন্ত্রীরা, এলেন বিজ্ঞানীরা আর এলেন বিজ্ঞান কলেজ—বিজ্ঞান পরিষদ—আই. এস. আই-এর কর্মীরা। বাংলাদেশ—ঢাকা থেকে ছুটে এলেন তাঁর বন্ধুগণ। আর এলেন কিশোর-কিশোরীরা।

আদর্শের অভাবে কিশোর-কিশোরীদের মন-প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে ; সিনেমার লাইনে অথবা অশান্ত বিদ্যায়তনের-হৈ হুল্লোড়ে অথবা মিছিলের শ্লোগানে মরছে সে প্রাণ দু'বেলা। আদর্শের আলো নিয়ে তাঁদের জন্য কেও পথ দেখাচ্ছে না যে। দুর্মূল্যতার জন্য দুবেলা পেটভরা আহার জোটে না। বই কাগজের দাম আকাশচুম্বী। সন্ধ্যা হ'লেই আলো নিভে যায়—কেরোসিন দুষ্প্রাপ্য। ফুটন্ত ফুলের এ কী জীবন। এ জীবন কেও কোনদিন দেখি নি।

ওঁরাই এসেছেন দলে দলে। ওঁরা যে দেখেছেন জানালার ধারে এক অঙ্ক কষা বুড়ো। পেয়েছেন তাঁর স্নেহ ও সহানুভূতি ; চিনেছেন একটি আদর্শ পুরুষ—সারা কোলকাতা খুঁজেও তাঁরা যা পান নি।

সত্যেন বোসের শেষ ইচ্ছা ছিল কেওড়াতলার বৈদ্যুতিক চুল্লীতে যেন তাঁর নশ্বর দেহের সদ্‌গতি করা হয়। আর তাঁর শব যেন হিন্দু সংকার সমিতির গাড়ি করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর শেষ ইচ্ছা মতো কাজ হ'লো। হিন্দু সংকার সমিতির গাড়ি এলো।

ভিড়ের জন্য গাড়ি গলিতে যেতে পারলো না। রাস্তার উপর থাকলো শবদেহ-বাহী গাড়ি।

সত্যেন বোসের পূত শবদেহ নিয়ে হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ি চললো বরানগরের আম্রপালি—যেখানে নিভৃতে চলছে সংখ্যায়নের কাজ—সেই ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনষ্টিউটে : সংক্ষেপে যার নাম আই. এস. আই। তারপর গাড়ি ফিরে এসে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ঘুরে এলো বসু বিজ্ঞান মন্দির ও বিজ্ঞান কলেজে।

কিশোর কিশোরীরা এখানে এসে জড়ো হয়েছিলেন। তাঁরা শবযাত্রী ও শবদেহ-বাহী গাড়ির সঙ্গে পদব্রজে হেঁটে চললেন দ্বারভাঙা বিল্ডিংস পর্যন্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গাড়ি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ভবন ও ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স এবং এশিয়াটিক সোসাইটি হয়ে চললো **Indian Association for the Cultivation of Science** ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। পিছনে সেই জনতার মিছিল। পরিশ্রান্ত হয়ে লোক চলে যাচ্ছেন আবার আসছেন নূতন লোক।

এবার কেওড়াতলা শ্মশান। রাত্রি পৌনে আটটা। মুখাগ্নি করলেন বড় ছেলে রথীন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-নাতি-নাতনী সবাই উপস্থিত ছিলেন। শুধু অনুপস্থিত ছোট ছেলে আর ছোট মেয়ে। তাঁরা মার্কিন মুলুকে পড়ছেন। তার গেছে। শ্রাদ্ধের আগেই তাঁরা এসে পড়বেন।

জ্বলে উঠলো বৈদ্যুতিক চুল্লী। নিভলো চিতার আগুন কিন্তু অনির্বাণ শিখা তাঁদের অন্তরে জেগে থাকলো। যাঁরা বাংলাকে ভালবাসেন, বালাভাষাকে ভালবাসেন—চান্ বাংলার মঙ্গল।

॥ শোক-বার্তা ॥

শ্রীভি. ভি. গিরি : রাষ্ট্রপতি, ভারত—

বিজ্ঞানের অধ্যাপক বোসের কৃতিত্ব ভারত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে চিরদিন—কেন না তাঁর আজীবন বিজ্ঞান-চর্চায় ভারতের নাম হ'লো চির ভাস্বর।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী : প্রধান মন্ত্রী; ভারত—

অধ্যাপক বোসের মৃত্যুতে ভারত হারালো একজন মহান বিজ্ঞানী ও মনস্বী পণ্ডিত। পাঠকক্ষ ও গবেষণাগারে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাজ করে সামাজিক কর্তব্য পালন করেছেন। তাঁর সারল্য ও আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ ছিলাম। তাঁর মৃত্যুতে আমি জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

শেখ মুজিবর রহমান : প্রধান মন্ত্রী, বাংলাদেশ—

বাংলার মহান্ সন্তান বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী ডঃ সত্যেন বোসের মহাপ্রয়াণে আমি মর্মাহত। বিজ্ঞান ও মানবতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

রাষ্ট্রদুত : ইউ. এস. এস. আর (কলিকাতা)—

রথীন বোসকে......কলকাতায় অবস্থিত ইউ. এস. এস. আর-এর রাষ্ট্রদূত হিসাবে আমি আপনার পিতা প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বোসের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছি এবং আপনার শোকে সমবেদনা জানাচ্ছি। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা 'কোয়ানটম সংখ্যায়ন তত্ত্ব'-এ তাঁর বিশিষ্ট অবদান সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন এবং তাঁর মৃত্যুতে তাঁরা গভীরভাবে শোকার্ত।

ডঃ এইচ. এফ. লিনসার : রাষ্ট্রদুত—দি ফেডেরাল রিপাবলিক অফ জার্মানী (কলকাতা)—

সত্যেন বোসের বিধবা স্ত্রীকে······আপনার নিকট আমি জানাচ্ছি আপনাকে এবং আপনার পরিজনদের আমার ঐকান্তিক ও আন্তরিক সমবেদনা। অধ্যাপক বোস ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং তাঁর সাথে কয়েকবার দেখা করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার দেশ সম্বন্ধে তাঁর বাস্তব আগ্রহ আমার এখনও মনে আছে। সারা ভারতের সাথে সমগ্র বিজ্ঞান-জগৎ তাঁর মৃত্যুতে হবেন শোকমগ্ন।

॥ বার ॥

॥ শোক ও স্মরণ-সভা ॥

॥ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর তিরোধানে দুটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। ৯ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭৪)-তে বিজ্ঞান পরিষদের কার্যকরী সমিতির এবং ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭৪)-তে বিজ্ঞান পরিষদের সদস্যদের শোকসভার অনুষ্ঠান হয়। সদস্যদের সভায় সভাপতিত্ব করেন সত্যেন বোসের সহপাঠী প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সদস্যগণ এক মিনিটকাল নীরবতা পালন করেন এবং দুটি শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়।

॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন অধ্যাপক এবং বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌরব বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী সত্যেন বোসের স্মৃতিতে ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেনের সভাপতিত্বে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কর্মী ও ছাত্ররা নীরবে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় / পদার্থবিদ্যা বিভাগ ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপকগণ ও ছাত্র-ছাত্রীরা আচার্য সত্যেন বোসের মহাপ্রয়াণে একটি শোকসভার অনুষ্ঠান করেন—৬ই ফেব্রুয়ারী। এই সভায় আচার্য বোসের স্মৃতি রক্ষার্থে 'বোস চেয়ার' নামে একটি বিভাগীয় অধ্যাপকের পদ সৃষ্টির এবং বিজ্ঞান পাঠাগারের নাম 'বোস গ্রন্থাগার' রাখবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায় / পদার্থবিদ্যা বিভাগ ॥

অধ্যাপক আহমদ হোসেনের সভাপতিত্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপকগণ ও ছাত্র-ছাত্রীরা আচার্য সত্যেন বোসের মহাপ্রয়াণে একটি শোকসভার অনুষ্ঠান করেন—১১ই ফেব্রুয়ারী। এই সভায় আচার্য বোসের বিজ্ঞান প্রতিভা, উন্নত চরিত্র ও অসামান্য ব্যক্তিত্বের কথা উল্লিখিত হয়।

॥ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ॥

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন বোসের মহাপ্রয়াণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রমেশ ভবনে একটি শোকসভা হয়—ফেব্রুয়ারী ১৭, ১৯৭৪। বাংলা-ভাষাকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম করবার জন্য তাঁর মহতী প্রচেষ্টাকে স্মরণ করেন ডঃ মহাদেব দত্ত, ডঃ জয়ন্ত বোস, অধ্যাপক পরিমলকান্তি ঘোষ এবং অধ্যাপক মদনমোহন কুমার।

॥ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ॥

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে রামমোহন লাইব্রেরী হলে বিজ্ঞানাচার্য সাহিত্যিক সত্যেন বসুর মহাপ্রয়াণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়—ফেব্রুয়ারী ১৯,১৯৭৪। তাঁর ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি

অসীম দরদের কথা উল্লেখ করে বিভিন্ন বক্তা তাঁর স্মৃতিচারণ করেন সভায় সভাপতিত্ব করেন 'পরিচয়' সাহিত্য-গোষ্ঠীর ,কর্ণধার বিজ্ঞান লেখক আচার্য সত্যেন বসুর বাল্যবন্ধু গিরিজাপতি ভট্টাচার্য।

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট

(আই. এস. আই)

[ভারতীয় পরিসংখ্যান মন্দির]

আম্রপালি-বরানগর

প্রশান্ত মহলানবীশ প্রতিষ্ঠিত 'ভারতীয় পরিসংখ্যান মন্দির'-এর অধ্যাপক, গবেষক ও কর্মীদের এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় আম্রপালিতে ৬ই ফেব্রুয়ারী—১৯৭৪। 'পরিসংখ্যান মন্দির'-এর উন্নতিমূলক পরিচালনায় আচার্য বসুর অবদান সসম্ভ্রমে স্মরণ করা হয়।

॥ কলিকাতা গণিত সমিতি ॥

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে কলিকাতা গণিত-সমিতির হলে প্রখ্যাত গণিতাচার্য সত্যেন বসুর মহাপ্রয়াণে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়—ফেব্রুয়ারী ১৩,১৯৭৫। কলিকাতা গণিত-সমিতির কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ ও সাধারণ সদস্যগণ এই শোকসভায় আচার্য বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

॥ বসু সংখ্যায়ন পঞ্চাশবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি ॥

উক্ত কমিটির স্থানীয় শাখা 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবন' এ আচার্য সত্যেন বসুর মহাপ্রয়াণে এক স্মরণ সভার আয়োজন করেন। স্মরণ সভার সুরু হয় আচার্য বসুর আদ্যশ্রাদ্ধের দিন, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪ এবং সমাপ্তি ঘটে—১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে আচার্য বসুর প্রতিকৃতিতে নানা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে মাল্যদান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। এই দিন 'ছবিতে আচার্য

সত্যেন্দ্রনাথ' নামক একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। পরবর্তী অনুষ্ঠান ছিল আচার্য বসুর প্রিয় রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন এবং আচার্য বসুর টেপ-রেকর্ড ভাষণ পরিবেশন।

॥ কলকাতার নাগরিকদের স্মরণ-সভা ॥

এই সভা আহ্বান করেন ২রা মার্চ ১৯৭৪ কলকাতার 'রবীন্দ্র সদন' -এ শেরিফ রুশী গিমি। খ্যাতনামা নাগরিকগণের আচার্য বসুর স্মৃতিচারণ ও শ্রদ্ধানিবেদন, বিভিন্ন চেম্বার অফ্ কমার্সের পক্ষ থেকে আচার্য বসুর প্রতিকৃতিতে পুষ্প দান এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন ছিল অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সভায় আচার্য সত্যেন বসুর একটি প্রামাণ্য জীবন গ্রন্থ প্রকাশনার প্রস্তাব উঠে। সভায় উপস্থিত পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় এ বিষয়ে সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

॥ তেরো ॥

॥ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও সত্যেন বসু ॥

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম বাঙালীর নবজাগরণের কাল। ধর্মসংস্কারে, নবসাহিত্য সৃষ্টিতে, স্বাদেশিকতায়, রাজনৈতিক মুক্তিযজ্ঞে এবং বিজ্ঞান-সাধনায় ও নবকর্মের উন্মাদনায় বাঙালী সেদিন চঞ্চল। এই নবকর্মের মধ্যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্যোগ অন্যতম আর এর প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা শ্যামবাজার অঞ্চলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডের উপর অবস্থিত 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ'। যে বছর (ইংরাজী ১৮৯৪। বাংলা ১৩০০) সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম, সেই বৎসর 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' স্থাপিত হয়। এর মুখপত্র— 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'। বিজ্ঞানশাস্ত্রে প্রচলিত ইংরাজী শব্দ। তাই তার বাংলা পরিভাষার সৃষ্টির ভার নিল সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা

এবং এই কাজে অগ্রণী হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও আচার্য জগদীশচন্দ্র, অধ্যক্ষ ও বিজ্ঞানলেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বাঙালী সংস্কৃতির গবেষক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং বিজ্ঞান-লেখক চুণিলাল বসু ও জগদানন্দ রায় প্রমুখ বাঙালী লেখকগণ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ হ'তে লাগলো 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর মুখপত্র 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'। 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ' বাংলায় বিজ্ঞান বই প্রকাশনায়ও হাত দিলেন। নলিনাক্ষ ভট্টাচার্যের 'মনোবিজ্ঞান' এবং গিরিশচন্দ্র বসুর 'উদ্ভিদ-জ্ঞান' প্রকাশ করলেন 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ'।

'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর মুখপত্র 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা' ছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞান পত্রিকার ঘটলো আবির্ভাব। তন্মধ্যে অগ্রণী 'বিজ্ঞান' পত্রিকা: স্থাপনাকাল—১৯১৩। এর সম্পাদক Indian Association for the cultivation of Science নামক প্রথম গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের পুত্র ডঃ অমৃত লাল সরকার।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার আন্দোলনে পরবর্তীকালে অগ্রণী হন সত্যেন বসু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময় [১৯২১-৪৪] তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী হন এবং সহকর্মী বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় প্রকাশ করেন দ্বৈমাসিক পত্রিকা 'বিজ্ঞান পরিচয়'।

নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী এক্স-রে আবিষ্কারক রমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের ছিলেন প্রধান অধ্যাপক।

১৯৪৪ সনের অক্টোবর মাস। সত্যেন বসু হলেন কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের পদার্থ বিদ্যার খয়রা অধ্যাপক। ঢাকা ছেড়ে চলে এলেন কলকাতায়। অধ্যাপনা কালে সত্যেন বসু অনুধাবন করেন যে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষায় স্বাধীন চিন্তা ও জ্ঞান স্পৃহা জন্মে না এবং মুখস্থ করবার উৎসাহ বাড়ে। তজ্জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা হয় সত্যেন বসুর পণ।

কেন্দ্রীয় সরকার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাদান ছাড়া যখন অন্য কিছুর চিন্তা করতে পারছেন না, তখন সত্যেন বসু এদেশে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারে হলেন কৃতসঙ্কল্প। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর অনুসরণে স্থাপনা করলেন 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' :—জানুয়ারী ২৫,১৯৪৮।

রামমোহন লাইব্রেরীতে হ'ল এর আস্তানা এবং বিজ্ঞান কলেজে সত্যেন বসুর ঘর হ'ল এর আপিস। প্রধান কাজ হ'ল 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' এর মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশ—যার মাধ্যমে সুরু হ'ল বাংলাভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার একটি সুসংহত প্রচেষ্টা।

'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' এর প্রথম ঠাঁই হয় 'বসুবিজ্ঞান মন্দির'। তার পর 'ফেডারেশন হ'ল-এর ভাড়া-করা ফ্লাট। এখানে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ'-এর কাজকর্ম চললো—১৯৫৬ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত। এখানে 'লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালা'-র অল্প দামে বিজ্ঞানের দরকারী বই ও বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক ছাপা হতে থাকে। ইতিমধ্যে তৈরী হ'ল গোয়াবাগান পার্কের গায় পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলকাতা—৬-এ 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ'-এর বড় বাড়ি।

লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালায় এ যাবৎ বার হয়েছে পঁচিশখানা বই। এই প্রকাশিত বইগুলোর একমাত্র পরিবেশক : ওরিয়েণ্ট লঙম্যান এণ্ড কোং লিঃ। ১৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলি—১৩।

বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা ও বিজ্ঞান পুস্তক প্রকাশ ছাড়া 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' পরিচালনা করেন বিজ্ঞানপুস্তক পাঠাগার ও গ্রন্থাগার। এ ছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'হাতে কলমে বিভাগ'-এর আছে আয়োজন।

এই "বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ"-এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি সত্যেন বসু। কর্ম-সচিব বৈজ্ঞানিক ডঃ জয়ন্ত বসু। 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ'-এর সহঃ সভাপতি এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার অন্যতম উপদেষ্টা

ডঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল পরিষদের বাড়ি তৈরীর ব্যাপারে সত্যেন বসুর প্রচেষ্টার কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন :

> পরিষদের একটি স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য তিনি প্রথম থেকেই চেষ্টা করছিলেন এবং কখনো বা কেন্দ্রীয় সরকার, কখনো বা প্রাদেশিক সরকার আবার কখনো বা বিশিষ্ট ধনীদের এবং সকল সময়েই জনসাধারণের কাছে গৃহনির্মাণকল্পে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছিলেন অক্লান্তভাবে। তা ছাড়া তিনি উৎসাহী সহকর্মীদের বললেন কার্যকরী সমিতির সভ্যেরা অন্যূন আড়াই শো টাকা করে না দিলে অন্যের কাছে এই বাবদে সাহায্য চাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। কথাটি আমরা সকলেই সশ্রদ্ধ চিত্তে মেনে নিলাম। [উদ্ধৃতি : জ্ঞান ও বিজ্ঞান—১৯৭৪ (মার্চ)]

১৯৬৯-৭০। গোয়াবাগানে নূতন তৈরী বাড়িতে চলে গেছে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ'। বাড়ি তৈরীর কাজ তখনও চলছে। মাটির তলায় ঘর। ছাদে ঘর।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তখন ভয়ানক খারাপ। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে অগ্নিকাণ্ডে গবেষণাগার ভস্মে পরিণত। সে সময় স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্বলছিল আগুন। সত্যেন বসু বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নূতন বাড়ির দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন—বাংলা ভাষা, বাঙালীর সাধনা। এতে কেন এতো তাণ্ডব!

সত্যেন বসুর একান্ত সাধ ছিল 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহশালা স্থাপন। তাঁর সে সাধ পূর্ণ হয়নি। বাংলায় ধনীর অভাব নেই। এই বাজারে অনেক নূতন নূতন ধনী হচ্ছেন। সত্যেন বসুর সাধ পূর্ণ করবার জন্য তাঁরা কী এগিয়ে আসবেন?

বর্তমান সরকার তো নানান্ প্রকল্পে দু হাতে টাকা ছড়াচ্ছেন। তাঁরা কি এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেবেন? এ কাজটা ও দেশের মঙ্গলকর। বাংলা আজ এক অভাবনীয় দুর্গতির মধ্যে পড়ে আছে। পল্লীর কৃষক কারিগর ও একদা সম্ভ্রান্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত আজ অর্থহীন

অন্নহীন বস্ত্রহীন। শিক্ষা আর জ্ঞান আগুনে পুড়ছে আর তখন ভদ্রজনগণ পরিবেশিত থিয়েটার, সিনেমা, রেডিও, ন্যাংটা মেয়ের নাচ, ছবি, মদ, ছোরা-পিস্তল আর ফকক্রামি ও নোঙরামিভরা প্রেমের ন্যাকামি গান ও গল্পে অশান্ত যৌবনকে জাহান্নমে পাঠাচ্ছে। এই 'ভদ্রজনগণ' এর কানে আমাদের পৌঁছে দিতে হবে বারতা : বাংলায় এখনও মানুষ আছে ; এখনও কাল রাত্রির অন্ধকারে কতো শিশু 'সত্যেন' বাঙালীর প্রতিভাকে ধ্বংস করবার চক্রান্তকে ব্যর্থ করবার সাধনায় মাথা খুঁড়ে মরছেন। সরকার ও দেশবাসী, শিক্ষা বাঁচাও-নচেৎ বাঙালী মরবে। সত্যেন বসু শিক্ষাব্রতীদের তাই বলতেন—স্কুল কলেজে মাইনে টাইনের কথা ভুলে প্রাণভরে ছেলেমেয়েদের পড়াও!

সত্যেন বসু শিক্ষা ও জ্ঞানের আদর্শ! করপোরেশন তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য কোন রাস্তার নাম করবেন? আই. এস. আই-এর সামনেকার বি. টি. রোড অথবা 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ'-এর রাস্তা রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট অথবা ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সের রাস্তা দিলখুসা স্ট্রীটের নাম বদলিয়ে সত্যেন বসুর নামে নামকরণ করা উচিত আর গোয়াবাগান পার্কের নাম সত্যেন বসু পার্ক করা উচিত! সাগ্রহ অপেক্ষায় রইলেন দেশবাসী।

॥ চৌদ্দ ॥

॥ সাহিত্যিক সত্যেন বসু ॥

সত্যেন বসু বিজ্ঞানী। সত্যেন বসু সাহিত্যিক। প্রথম চৌধুরী (বীরবল)'র 'সবুজপত্র' উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'বিচিত্রা' ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-এর 'পরিচয়' গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত ছিলেন সত্যেন বসু। 'পরিচয়' এ তাঁর অনেকগুলো লেখা বার হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য কাগজেও তাঁর লেখা দেখা যায়। তাঁর লেখা বিশেষতঃ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ। লিখেছেন বাংলা ভাষায়, লিখেছেন ইংরেজী ভাষায়।

দুটোতেই তাঁর সমান দক্ষতা। তিনি ফরাসী ও জার্মানী ভাষা জানতেন কিন্তু ওতে কিছু লেখেননি।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রিয়পাত্র ছিলেন সত্যেন বসু। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' বই সত্যেন বোসকে উৎসর্গ করেন। সত্যেন বসুর লেখা বই 'বিজ্ঞানের সঙ্কট ও অন্যান্য প্রবন্ধ' বই-এর জন্য 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' তাঁকে দেন 'জগত্তারিনী পদক'।

লেখক হিসাবে সত্যেন বসু ছিলেন ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক। তিনি ছিলেন শান্তিবাদী। তাঁর বিজ্ঞান ধ্বংসের জন্য নয়—মঙ্গলের জন্য, সৃষ্টি জন্য। তাঁর সাহিত্যের ধর্মও এই।

তাঁর স্বপ্ন ছিল মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা। এর জন্য তাঁর 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' প্রতিষ্ঠা এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশন।

বাংলাভাষাকে তিনি ভালবাসতেন—ভালবাসতেন বাংলাকে। আচারে মননে ও ভাবনায় তিনি ছিলেন শুদ্ধ বাঙালী। তিনি মনে করতেন বিজ্ঞান ছাড়া মানুষের মঙ্গল ও উন্নতি সম্ভব নয়—ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার ছাড়া জাতির উন্নতি ও মর্যাদা বাড়ে না। কারণ অজ্ঞতা ও কুশিক্ষা উৎসাহও আত্মবিশ্বাসের প্রতিবন্ধক। তিনি দুঃখ করতেন জাপানের শতকরা ৯০ জনই শিক্ষিত আর বাংলায় শতকরা ৯০ জনই প্রায় অশিক্ষিত। বাঙালীর এ ব্যথা বাঙলীর প্রাণে বাজে কৈ?

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের জন্য তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। ঢাকাতে কাজ করবার সময় বিজ্ঞান সহযোগীদের নিয়ে বার করেন দ্বৈমাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা—"বিজ্ঞান পরিচয়" আর কলকাতায় এসে বার করেন বিজ্ঞান পরিষদ মারফৎ বিজ্ঞান পত্রিকা—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'...একটি আধুনিক বিজ্ঞান মাসিকী।

আশুতোষ-রবীন্দ্রনাথ ও জগদানন্দ-রামেন্দ্রসুন্দরের মাতৃভাষায় বিজ্ঞানসাধনার উত্তরসাধক সত্যেন বসু। আজ তিনি গত কিন্তু তিনি রেখে যাচ্ছেন 'বিজ্ঞান পরিষদ' আর অসংখ্যক বিজ্ঞানী বন্ধু ও বিজ্ঞানী ছাত্র-ছাত্রী। তাঁরাই তাঁর বাংলাভাষায় বিজ্ঞান সাধনার স্বপ্নকে সার্থক করবেন।

॥ শিল্পী ও মজলিসী মানুষ—সত্যেন বসু ॥

বাল্যকাল থেকে সত্যেন বোসের বাংলা সাহিত্য ও ফরাসী সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণের সাথে সত্যেন বোসের আবৃত্তি, সঙ্গীত ও বাজনার প্রতি ছিল আকর্ষণ। আবৃত্তির মধ্যে প্রধান ছিল 'মেঘদূত' আবৃত্তি, সঙ্গীতের মধ্যে ছিল শাস্ত্রীয় ও রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং বাজনার মধ্যে এসরাজ ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। সাহিত্যে যেমন ছিল তাঁর অনাড়ম্বর ভাষা, তেমন শিল্পে ছিল তাঁর বিদেহী আত্মার অনুপ্রেরণা। রমা রোঁলার প্রভাব, বিশ্বপ্রেমের আদর্শ তাঁর অনুপ্রেরণা—কিন্তু বাংলা ভাষার আকর্ষণ ও বিজ্ঞান-চর্চায় বাঙালীর দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণের দেশসেবী ও স্বদেশী মনোভাব সেই সুদূর পথযাত্রায় তাঁকে করলো স্তব্ধ। তাঁর মত ছিল—বিজ্ঞান-শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা ও প্রযুক্তি বিদ্যা ছাড়া বাংলার দুঃখ-দুর্দশা দূর করা অসম্ভব।

* * * *

মজলিসী আর খেয়ালী ছিলেন সত্যেন বসু। কৈশোরে ছিল হেদুয়ার আড্ডা, ঢাকায় ছিল 'বারোজনা-র আসর,' কলকাতায় ছিল 'বীরবলের রসচক্র'। নেশার মধ্যে ছিল সিগারেট। ফুল আর গানে এবং সিগারেটের ধুমে মন থাকত ডুবন্ত। বড়দের সাথে দাবা, ছোটদের সাথে খেলতেন ক্যারাম। কিশোররা তাঁর সাথী—তাই 'কিশোর কল্যাণ পরিষদে'র শিশু ও কিশোরদের আসরে তাঁর ছিল আনাগোনা।

খেতে ও খাওয়াতে তিনি ভালবাসতেন। সাম্প্রতিক আকাশচুম্বী দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি তাঁকে অবশ্য কাবু করেনি কিন্তু ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের জন্য তিনি বিশেষ বিব্রত হন এবং তাঁর প্রিয় খাদ্য খাঁটি ঘিতে ভাজা খাঁটি লুচির বিরহ তাঁর শেষ জীবনে মাঝে মাঝে হ'ত অসহনীয়। তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল সন্দেশ কিন্তু শেষ জীবনে 'ডাইয়েবেটিস'-এর জন্য সন্দেশ খাওয়া হয় তাঁর বন্ধ। তবুও অভ্যাগতদের জন্য সন্দেশ তাঁর ঘরে থাকতো সব সময় মজুত।

অদ্ভুত মানুষ সত্যেন বসু। বিজ্ঞান কলেজ ছিল তাঁর সর্বস্ব। পিতৃসুলভ স্নেহ ছিল তাঁর ছাত্রছাত্রী ও কনিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের উপর। সামান্য পিয়ন ও বেয়ারা ছিল তাঁর আপনার লোক। পদার্থবিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞানেও ছিল তাঁর জ্ঞান। তাই সব রকম ছাত্রই ছিল তাঁর আপনার। এঁদের তিনি পড়াতেন, বোঝাতেন খুব যত্নের সাথে। বাংলায় আলোচনা করতেন—বাঁধাধরা সময় ছিল না; পড়াতেন ঘন্টার পর ঘন্টা। পড়ানোর কায়দা ছিল এমন যে ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ যেন বিষয়-বস্তুর দিকে হয়—ভাষার দিকে নয়।

মানুষকে তিনি ভালবাসতেন—ছোটই হ'ক আর বড়ই হ'ক। তাঁর এক চাকর তাঁর দুধ চুরি করে খেতো। ধরা পড়লে সত্যেন বসু তাকে শাস্তি দিলেন না—বরং তার জন্য দুধ বরাদ্দ করলেন। প্রাণীদের তিনি ভালবাসতেন। তাঁর অনেকগুলো পোষা বিড়াল ছিল। তারা তার বিছানায় শুয়ে থাকতো। তিনি বিড়াল কোলে করে অভ্যাগতদের সাথে গল্প করতেন।

দুঃখীর দুঃখে তিনি হতেন কাতর। বন্ধু পেলে হতেন আত্মহারা। সবচেয়ে দেখি তাঁর মত ঋষিসম নিরাসক্ত ও নিরহঙ্কার মানুষ আজ অবক্ষয়ের দিনে দুর্লভ। আমাদের আশপাশে আজ ভাঙাচোরা মানুষের মিছিল। সে সময় আমরা হারালাম একটা গোটা মানুষ—আশী বছর পড়েও যিনি ছিলেন সৃজন চিন্তায় কাতর। মাতৃভাষায় শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চা ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। তিনি বলতেন—যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা সম্ভব নয়—তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না। শিক্ষা মানে তিনি বুঝতেন সার্বজনীন শিক্ষা আর তার মাধ্যম নিশ্চয়ই মাতৃভাষা। স্বাধীনতার পর বড় বড় মানুষদের বড় কদর দেখে ব্যথিত হয়ে তিনি বলতেন: "স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটি দায়িত্ব হয়েছে। এই স্বাধীনতার যা কিছু সুফল তা যেন অল্পসংখ্যক শিক্ষিতের আয়ত্তের মধ্যে না থাকে, সেগুলি যেন দেশের লোকের সকলের কাছে পৌঁছে যায় ..."।

পরিশিষ্ট

বিজ্ঞান মঙ্গলদায়ক কিন্তু লোভীদের বশে বিজ্ঞান হয় মন্দ। এই মন্দ দিক দুটি। একটি বিজ্ঞানকে লুটের ব্যবসায়ে নিয়োগ ও আর একটি বিজ্ঞানের খুনী অপপ্রয়োগ—মাটির তলায় সঞ্চিত তেল বা কালো রস (Black Juice)। মাটির তলা থেকে এই তেল নিষ্কাসন বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। যাঁর হাতে এই তেলের কূপ তার মুনাফার পাহার আকাশচুম্বী। এক ব্যারেল তেল (ব্যারেল= ৩৬ গ্যালন=১৬৪ লিটার)-এর জন্য ব্যয় আনুমানিক আট আনা থেকে এক টাকা আর আমরা কিনি প্রায় আশী টাকায়। কি রকম লাভ দেখুন। একশো দেড়শো গুণ লাভ।

এতো টাকা যাঁদের হাতে তাঁদের অর্থনৈতিক শাসন যে কত ব্যাপক ও জোরদার তা সহজেই অনুমেয়। এঁরা শোষণ করছেন তেলের দেশের মাটি আর সেই মাটির মানুষ আর এর জন্য ঐ মাটি ও মানুষের শাসনযন্ত্র তাঁরা রাখেন নিজেদের কব্জায়। তেলা মাটির মানুষদের তাই যুদ্ধ হাঙ্গামা কেলেঙ্কারীর মধ্যে উঠছে নাভিশ্বাস আর তাদের সঙ্গে তেলের বাজারের মানুষরাও হচ্ছে জড়িত। নোবেল রথস চাইল্ড—রকফেলার প্রমুখ বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ীরা নানারকম বদান্যতায়—পছন্দসই (মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন বসু বিশেষ রাজনৈতিক ভাবনা ও সমাজ চিন্তার জন্য পছন্দসই হতে পারেননি) বুদ্ধিজীবিদের পুরস্কার দান ও ফাউণ্ডেশন স্থাপনা—নোংরা হাতের ময়লা ধুয়ে ফেলেছেন কিন্তু মানব জাতির পিঠ থেকে কালো রসের কালো দাগ ত' মুছে যায়নি।

কালো রসের পয়সায় পুঁজিপতির ও মুৎসুদ্দির অদৃশ্য কালো হাতের জ্বালায় আফ্রো-এশিয়ার সাধারণ মানুষ সামরিক চাপ ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের বলি। বিজ্ঞানের খুনী অপপ্রয়োগে-জাত মারাত্মক অস্ত্র, আণবিক শক্তি, বিষাক্ত গ্যাস, ভেজাল খাদ্য ও ঔষধ মানব জীবন করছে পর্যুদস্ত। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কৌশলে অস্ত্রব্যবসায়ীদের বাঁধানো লড়াই-এ আফ্রো-এশীয় মানুষদের দেহে ক্ষত আর পিঠে কালো রসের পয়সায় পুষ্ট পুঁজিপতি ও মুৎসুদ্দিদের অদৃশ্য কালো হাতের কালো ছাপ—যার প্রতিবাদে মুখর আজ (১৯৭৩-৭৪) ভারতবর্ষ।

১৯৭৩-৭৪ এর ভারত বিক্ষুব্ধ ভারত। চঞ্চল ইউরোপ, অশান্ত আফ্রিকা—এশিয়া, প্রতিবাদে মুখর……বিক্ষোভে ভরপুর ভারত। ……প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, আন্দোলন, ধর্মঘট। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে কালোবাজার ত্রস্ত। সরকার কর্মমুখী। আন্দোলনে ভেঙে যায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের রাজ্য বিধানসভা গুজরাটে…… বিহারেও যায় যায় অবস্থা। ধর্মঘট—লোকো, বিমান, ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার, নার্স, রেল। ঢেউ-এর পর ঢেউ-এর মতো উঠছে ধর্মঘট… বন্ধ। এরই মধ্যে চির নিদ্রায় অভিভূত হলেন আমাদের বিজ্ঞানী—বিশ্ব বিজ্ঞানী সত্যেন বসু। যাবার আগে তিনিই আমাদের দিয়ে গেছেন আশার বাণী—

> মানুষের ভবিষ্যৎ মানুষের হাতে—সে যদি অনুসরণ করে ব্যক্তি নির্বিশেষে দয়া ও সহযোগিতার মনোভাব, তা হলে যে সংঘাত ও দ্বেষের প্রকোপ আজ দেখা যাচ্ছে তার অবসান হবে। তা হলেই সার্বজনীন বিজ্ঞমানবের আবির্ভাব হবে।…
>
> ……ভবিষ্যতের সভ্যতা গড়ে তুলতে হবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, তার মধ্যে থাকবে সব মানুষের দান। বিজ্ঞানোচিত মনোভাব, হিংসা-দ্বেষের পরিবর্তে সহযোগিতা ও প্রেমের প্রতিষ্ঠা দরকার। বিজ্ঞানের পথেই জয়লাভ হবে।

সত্যেন্দ্র বসুর মহাপ্রয়াণের পর ঠিক সাড়ে তিন মাস গত। আজ এক মহাস্মরণীয় দিন—১৮ই মে, ১৯৭৪। সত্যেন বসু কথিত কল্যাণকর বিজ্ঞান সাধনার পথযাত্রার শুভ শঙ্খধ্বনি ভারতের মাটির ভূগহ্বরে হ'ল রণিত। বসু-গুরু আইনস্টাইনের যে বৈজ্ঞানিক অগ্নিকণাকে হাত করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিরোসিমা ও নাগাসাকি দ্বীপের নিরপরাধ মানুষদের হত্যা করেছিল তাকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগের মহড়া দিল আজ ভারতীয় বিজ্ঞান। রাজপুতানার মরু অঞ্চলের ভূগর্ভে হয় এই মহড়া।

১৮ই মে, ১৯৭৪। আজ ভূগর্ভে পরমাণবিক শক্তির প্রথম বিস্ফোরণ সাফল্যের সাথে সংঘটিত করলেন ভারতের পরমাণু বিজ্ঞানীগণ।

এতে কৃতী বিজ্ঞানী—

১। ভারতীয় পরমাণু শক্তি-কমিশনের (স্থাপনা : আগষ্ট ১০, ১৯৪৮) প্রথম সভাপতি ডঃ ভাবা (মৃত্যু : জানুয়ারী ২৪, ১৯৬৬)।

২। ভারতীয় পরমাণু শক্তি-কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান শেঠনা, ও ৩। ভাবাপরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের বর্তমান পরিচালক রামান্না।

সহকারী : বাঙালী বৈজ্ঞানিক ডঃ গাঙ্গুলী ও অন্যান্য ভারত ষষ্ঠ পরমাণু শক্তিধর। তার অগ্রগামী—

১। আমেরিকা—জুলাই ১৬, ১৯৪৫
২। রাশিয়া—সেপ্টেম্বর ২৩, ১৯৪৯
৩। ব্রিটেন—মার্চ ১৫, ১৯৫৭
৪। ফ্রান্স—ফেব্রুয়ারী ১৩, ১৯৬০
৫। চীন—অক্টোবর ১৬, ১৯৬৪

ভারত ওদের চেয়ে অনেক পশ্চাদপদ—কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সঙ্কল্পে অটল—অগ্রগতিতে প্রতিশ্রুত। এঁদের পরবর্তী পদক্ষেপ : হাইড্রোজেন বোম্ব।

ভূগর্ভের মুখ থেকে চার কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে রামান্না দেখছেন ভারতীয় পরমাণু শক্তির সফল বিস্ফোরণ।

অপরূপ দৃশ্য। ভূগর্ভস্থ মাটি পাথর ঠেলে উপরে উঠছে—সম্মুখে সৃষ্টি করেছে অদ্ভুত এক কৃত্রিম পাহাড়ের ছায়া। তেজস্ক্রিয়তা যতই কমে আসে, ততই রামান্না ভূগর্ভের মুখের দিকে অগ্রসর হন। বিস্মিত রামান্না—কৃত্রিম কালো পাহাড়ের ছায়া অপসৃত—মিলিয়ে গেছে যেন কোথায়।

ভাবা-সাহা-বোসের বিদেহী আত্মা রামান্নার কানে বলে যায় : বিজ্ঞানের অকল্যাণকর কৃত্রিম পাহাড় এমনি করেই শূন্যে মিলিয়ে যায়।

—:০:—